Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার করণীয় ও দায়িত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: সুলতানা আক্তার বৃষ্টি

রোলঃ 228020286

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার করণীয় ও দায়িত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: সুলতানা আক্তার বৃষ্টি

রোলঃ 228020286

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার করণীয় ও দায়িত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসা: সুলতানা আক্তার বৃষ্টি, আইডিঃ 228020286 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা মাতার করণীয় ও দায়িত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Bristy

(স্বাক্ষর)

মোসা: সুলতানা আক্তার বৃষ্টি

আইডিঃ 228020286

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

পিতা-মাতার মর্যাদা 2

পিতা-মাতার সদাচরণ পাওয়ার অধিকার 4

মা-বাবার সঙ্গে উত্তম আচরণের প্রতিদান 5

বাবা-মা হবার প্রস্তুতি 6

-পরিবার পরিকল্পনা 8

শিশুকে গর্ভে ধারণ 9

শিশু গর্ভাবস্তায় বাবা মায়ের নিয়ত: 11

মায়ের বিশেষ সতর্কতা: 12

নতুন মেহমানের আগমন 12

নতুন মেহমান আগমনের পর পিতা মাতার দায়িত্ব 13

-বাচ্চাকে মায়ের দুধ খাওয়ানো: 17

সন্তান আমার কাছে আল্লাহর দেয়া আমানত 17

সন্তান পালন এ যেন এক বিরাট দায়িত্ব 19

সন্তান লালন-পালনে সওয়াবের আশা করা 20

কথার চেয়ে কাজ কঠিন 21

শিশুর চাই একজন দক্ষ অবিভাবক 22

মহৎ কিছুর প্রস্তুতি 23

আমার সন্তানকে কীভাবে গাইড করব? 24

তরবীয়ত 25

তরবীয়ত কখন শুরু হবে? 26

সন্তান তরবীয়তের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 27

-অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং ভালোবাসা সৃষ্টি: 28

-সালাত শিক্ষা: 30
কোরআন তিলাওয়াতে অভ্যস্ত করা: 31
আদব শিক্ষা : 32
জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা: 33
সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিন: 34
সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্তা করুন...35
আত্মসংশোধনের শিক্ষা দিন 37
কল্যাণকর কাজে অভ্যস্ত করুন: 38
সন্তান রাগ করলে করনীয়: 39
ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা : 41
মেলামেশার সুযোগ দিন 43
আলেমদের বৈঠকে বসার সুযোগ করে দিন: 45
যোগ্যতা অর্জনে উৎসাহ প্রদান 46
দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিন 46
সন্তান ছোট-খাটো কিছু চুরি করলে যা করনীয়: 49
প্রয়োজনে শিশুকে শাস্তি দিন: 51
শাস্তি দানের পর শিশুকে আশ্রয় দিন: 52
সন্তানের প্রতি পিতা মাতার বর্জনীয় দায়িত্ব 54
মোবাইল না দেওয়া: 54
নোংরা ভাষায় কথা না বলা: 55
সন্তানের প্রশ্নে রেগে উঠবেন না: 57
সন্তানকে তিরস্কার না করা: 57
কিছু শেখানোর ক্ষেত্রে কঠোরতা পরিহার করুন: 59
মিথ্যা ওয়াদা না দেওয়া: 60

অপরাধ প্রশ্রয় না দেওয়া:..62
সন্তানদের একাডেমিক ইসলামী শিক্ষা 65
সন্তানের পড়ালেখায় পিতা মাতার সহায়তা..66
সন্তানের পরিনত বয়সে শুভ পরিণয়...70
দায়িত্ত পালনে আমি কি সফল?...72
পরিসমাপ্তি...74
সাহায়ক গ্রন্থ:...75

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُن آل لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الذَّي أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

ভূমিকা

দুনিয়াতে যত মধুর সম্পর্ক রয়েছে তার মাঝে অন্যতম একটি সম্পর্ক হলো সন্তানের সাথে বাবা মায়ের সম্পর্ক।

'বনি আদমের মৃত্যুর পর তার আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিন ধরনের আমল ছাড়া-

১. সাদাকায়ে জারিয়া।

২. উত্তম জ্ঞান, যার মাধ্যমে মানবজাতি উপকৃত হয়।

৩. উত্তম সন্তান, যে মৃত্যুর পর তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

-মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় যে পিতা-মাতা ও সন্তানদের মাঝে একধরনের জেনারেশন গ্যাপ তৈরি হয়ে আসছে, কিশোর বয়সে যা অনেক বড় আকার ধারণ করে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উত্তমরূপে তৈরি করে তাদের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করা অভিভাবকদের জন্য একধরনের চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এই চ্যালেঞ্জের সফলতা মূলত নির্ভর করে সন্তানরা কত আদর্শিক উপায়ে লালিত-পালিত হচ্ছে তার ওপর। যে সকল সমাজ এই সন্তানদের উত্তমরূপে লালন-পালনের দায়িত্বকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে, তারাই সফল হয়েছে। যারা এই দায়িত্বকে মামুলি মনে করে এবং খামখেয়ালিপনার মাধ্যমে পালন করে।তারাই ব্যর্থ হয়েছে

শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণের পথ মসৃণ নয়। কিশোররা অনেক তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এবং এই বেড়ে উঠার পথে তারা অনেক ধরনের শারীরিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়। প্রাথমিকভাবে তারা নিজেদের প্রতি, নিজেদের শরীর ও ব্যক্তিত্বের প্রতি যত্নশীল হয়ে থাকে। তারা শারীরিকভাবে শক্তিশালী, অধিক মনোযোগী এবং সামাজিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে।

বর্তমান বৈশ্বিক পরিবেশে একজন তরুণ যৌবনে পদার্পণের সাথে সাথেই কর্তব্যহীনতা, পিতা-মাতার চরম অবাধ্যতা, সমাজবিরোধী কার্যক্রম, অনিয়ন্ত্রিত যৌনতা, অনিরাপদ গর্ভধারণ, মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। যে সমাজ এই সমস্ত বিষয়াবলিকে মামুলিভাবে দেখবে, সেই সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে এবং এই সমস্ত সামাজিক সমস্যাবলি সমাজের জন্য বিরাট উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে-যে সমাজে তরুণদের স্বাধীনতাকে চরমভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং কিশোররা প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা শাসিত হয়, সে সমাজে তরুণরা কর্তৃত্বশীল আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। তরুণদের ভালো নাগরিক কিংবা আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাদের অবশ্যই সমাজের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করাতে হবে এবং তাদের মাঝে সামাজিক দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করতে হবে, তাদের স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতার মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

কিশোরদের লালন-পালন সহজ কোনো বিষয় নয়। সন্তান কিশোর বয়সে পদার্পণ করার পর তাদের লালন-পালনে পিতা-মাতার শারীরিক পরিশ্রম কমে আসে বটে, কিন্তু এর পরিবর্তে তাদের আরও চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। এই সময় সন্তানদের সাথে কেবল একজন মাতা-পিতা হিসেবে নয়; বরং একজন শিক্ষক, পদপ্রদর্শক আদর্শবান ব্যক্তি এবং পরম বন্ধু হিসেবেও আচরণ করতে হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আদর্শিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সন্তানদের সাথে আমাদের পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন অত্যন্ত জরুরি।

সন্তানদের লালন-পালন প্রক্রিয়া একটি কঠিন চ্যালেঞ্জিং বিষয়, কিন্তু এর ফলাফল সুমিষ্ট। সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে মুসলিম পিতা-মাতার দায়িত্ব একধাপ বেশি। মুসলিম পিতা-মাতার ক্ষেত্রে সন্তানদের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পাশাপাশি তাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় মূল্যবোধের দিকেও সমানভাবে নজর দেওয়া কর্তব্য, যেন তাদের মধ্যে আত্মিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সন্তানদের সফলভাবে লালন-পালন করতে হলে মুসলিম পিতা-মাতাকে অবশ্যই সৃজনশীল ও গতিশীল ভূমিকা রাখতে হবে। তাদের সাথে যৌক্তিক, নমনীয় ও মাধুর্যতাপূর্ণ আচরণ করতে হবে।

পিতা-মাতার মর্যাদা

মানব সৃষ্টির ইতিহাসে আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:) ব্যতীত সকল সৃষ্টিই পিতা-মাতার মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে। কেবল ঈসা (আঃ) পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই ইসলামী শরী'আতে পিতা-মাতাকে অপরিসীম মর্যাদা দান করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপনের পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। তাদের আদেশ-নিষেধ শরী'আত বিরোধী না হ'লে তা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا- ً

'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা কর না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ কর না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার বাহু অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন'

সূরা-বনী ইসরাঈল ২৩-২৪

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্বীয় ইবাদতের সাথে পিতা-মাতার সেবাকে একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর মাধ্যমে এটিকে তাওহীদ বিশ্বাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বুঝানো হয়েছে। এর কারণ সৃষ্টিকর্তা হিসাবে যেমন আল্লাহ্ কোন শরীক নেই, জন্মদাতা হিসাবে তেমনি পিতা-মাতারও কোন শরীক নেই। আল্লাহর ইবাদত যেমন বান্দার উপর অপরিহার্য, পিতা-মাতার সেবাও তেমনি সন্তানের উপর অপরিহার্য।'

আল্লাহ আরও বলেছেন ;

اشكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

'অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই'

সূরা-লোকমান ১৪

এখানেও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে সমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্যত্র তিনি সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনে পিতা-মাতা যে অপরিসীম কষ্টভোগ করে থাকেন তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হ'লাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম'
সূরা-আহক্বাফ ১৫
অত্র আয়াতে চল্লিশ বছর বয়স উল্লেখ করার কারণ হ'ল- যে সন্তান এ বয়স পর্যন্ত পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করে তারা এর পরের বয়সে সাধারণত পিতা-মাতার অবাধ্য হয় না। তাদের চিন্তা থাকে তারা পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণ করলে তাদের সন্তানেরাও তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে।

পবিত্র কুরআনের বাণীগুলোকে পরম শ্রদ্ধা ও বিনয়াবনত হৃদয়ে মূল্যায়ন করতে হবে। এখানে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি অবিচল থাকা ও সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার, তাদের সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করা হয়েছে। আয়াতের শুরুতেই পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করে তাদের আনুগত্যের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর সকল আত্মীয়-স্বজন, আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রে পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে।

পিতা-মাতার সদাচরণ পাওয়ার অধিকার

ইসলামে আল্লাহর অধিকারের পর পিতা-মাতা সদাচরণ পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত, এমনকি তাদের কাফের-মুশরিক, পাপিষ্ঠ হওয়াকেও ভ্রুক্ষেপ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শরীয়াতে মা-বাবার অধিকারের ক্ষেত্রে যে বিন্যাসের খেয়াল রাখা হয়েছে তা অনন্য সাধারণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ - وَإِنْ جَاهَدَٰكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا

لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

"তুমি আমার কৃতজ্ঞতা বর্ণনা করো এবং তোমার মাতা-পিতার; (কেননা) আমারই দিকে তোমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, আর যদি তারা উভয়ে তোমাকে একথার উপর চাপ দেয় যে, তুমি আমার সাথে এমন কোনো বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত করো, যার (উপাস্য হওয়ার) কোনো প্রমাণ তোমার নিকট নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং পার্থিব বিষয়ে সম্ভাবে তাদের সাহচর্য করেই যাবে।"
সূরা- লোকমান ১৪-১৫

উক্ত আয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে- যদিও তারা মুশরিক হয়।

সূরায়ে লোকমানে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি।"
সূরা লোকমান ১৪

মা-বাবার সাথে সদাচরণের নির্দেশ শুধু মুসলিম উম্মাহকে দেয়া হয়নি। বরং আকীদা, চিন্তাধারা, ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানবজগৎকে একথা খুব দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে। وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَان -এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, উক্ত বিধানগত নির্দেশ শুধু মু'মিনদের জন্য নয়। সমস্ত উম্মত ও সকল ধর্মে মা-বাবার সাথে আচরণের ক্ষেত্রে এ রীতি বরাবরই চলে আসছে। এ বিধানের অকাট্যতায় মৌলিকভাবে কোনো বিভেদ করা হয়নি।
সকলক্ষেত্রে প্রায় একই নির্দেশনা এসেছে।

মা-বাবার সঙ্গে উত্তম আচরণের প্রতিদান

আনাস (রা:)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের হায়াত ও জীবিকার প্রশস্ততা কামনা করে, সে যেন মা-বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।
ফতহুর রাব্বানী

মুয়ায ইবন আনাস (রা:)থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:)বলেছেন, যে ব্যক্তি মা-বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে, তার জন্য সুসংবাদ হলো, আল্লাহ তার হায়াত বৃদ্ধি করে দেবেন।
আত তারগিব ওয়াত তারবিব

ওয়াহাব ইবন মুনিয়্যা (রা:) বলেন, মা-বাবার সঙ্গে সদ্বব্যহার সন্তানের
হায়াত বৃদ্ধি করে দেয়।
আদ দুররুল মানসুর

সাওবান (রা:)থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, দোয়া ব্যতীত কোনো কিছুই তাকদিরকে ফেরাতে পারে না। আর ব্যক্তির কৃত গুনাহ-ই তাকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে।
ইবনে মাজাহ

ইবন ওমর (রা:)থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমারা তোমাদের পিতাদের (পিতা ও দাদার) সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করো।
তাহলে তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সঙ্গে সদাচরণ করবে। তোমরা সচ্চরিত্রবান হও, তোমাদের নারীরাও সচ্চরিত্রবান হবে।
আত তারগিব ওয়াত তারহিব

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমরা পরনারীর প্রতি কুদৃষ্টি দেয়া থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রাখ এবং সচ্চরিত্রবান হও, তোমাদের নারীরাও চরিত্রবান ও পবিত্র হবে। তোমাদের বাপ-দাদাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো, তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।
আত তারগিব ওয়াত তারহিব

বাবা-মা হবার প্রস্তুতি

'আল্লাহ তাঁর দয়া-মায়ার শতকরা নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখে বাকি এক ভাগ পৃথিবীর সকলের মাঝে ভাগ করে দিয়েছেন। এই এক ভাগের কারণেই সৃষ্টিকুল একে অন্যের প্রতি দয়াশীল। এমনকী ঘোড়া তার শাবক থেকে নিজের খুর দূরে রাখে সন্তান পিষ্ট হয়ে যায় কি না

এই ভয়ে।'এই সুন্দর সম্পর্কের সূচনা করতে হলে আমাদের কিছু ধাপ অতিক্রম করতে হয়,সেগুলো নিম্নরূপ:

-বিয়ে

পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের প্রথম ধাপ হলো বিয়ে। বিয়ে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষকে আনন্দ, প্রশান্তি ও প্রবোধ জোগায়। এটি দুজনকে একই ছাদের নিচে বসবাস করার ক্ষেত্রে পারস্পরিক আপস-মীমাংসা ও ত্যাগের শিক্ষা দেয়। মানুষ যে ধরনের ব্যক্তিকে বিয়ে করতে চায়, তার ওপরই নির্ভর করে সন্তান কেমন হবে।

'সৎ ও বিশ্বাসী নারী-পুরুষ তাদের চরিত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ ব্যক্তিকেই জীবনসঙ্গিনী হিসেবে দেখতে চায়। অপরদিকে অসৎ সঙ্গীরা প্রাকৃতিকভাবে একে অপরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয়।'
সূরা নুর: ২৬

বিয়ে শুধু দুটি মানুষ নয় বরং দুটি পরিবারের মাঝে জীবনব্যাপী এক প্রতিশ্রুতি। এটিকে খুঁটিও বলা চলে, যার ওপর ভিত্তি করে লালিত হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সুন্দর এই বন্ধন সুদৃঢ় হওয়া খুবই জরুরি। একটি দাম্পত্য জীবন সুন্দর ও সুদৃঢ় হওয়ার জন্য নিম্নের বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে-

★ ভালোবাসা ও সম্মান
★মর্যাদা ও স্নেহ
★ দৃঢ়তা ও ক্ষমাশীলতা
★ন্যায়বিচার ও সমতা
★সততা ও আন্তরিকতা
★স্বচ্ছতা
★পারস্পরিক পরামর্শ
★বিশ্বস্ততা
★ত্যাগ-তিতিক্ষা
★ছাড় দেওয়ার মনোভাব।

যখন কোনো পরিবারে এসব গুণাবলির সম্মিলন ঘটে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মজবুত হয়, তখন সেখানে একটি আদর্শিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়-যা সন্তানের বেড়ে উঠার জন্য এটা খুবই সহায়ক।

পিতা মাতার দায়িত্ব একই সঙ্গে অনন্য ও দুঃসাহসিক। এই দুঃসাহসিক কাজ সম্পাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় হলো অঢেল দোয়া ও আল্লাহর ওপর ভরসা করা, কমনসেন্স কাজে লাগানো, খোলা মনের অধিকারী হওয়া এবং অধিক ধৈর্যশীল হওয়া। এই গুণগুলো একজন মানুষকে কঠিন দায়িত্ব পালনে এবং সফলতা অর্জনে সহায়তা করে।

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল অনেক সমস্যার সমাধান বের করে আনে। তাই পিতা ও মাতার শুরু থেকে পুরোটা সময় জুড়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে। নিজের ক্যারিয়ার, অর্থ ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে সন্তান জন্মদানের কোনো উপযুক্ত সময় নেই। তাই এই বিষয়গুলোকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করে সন্তান জন্মদানে অহেতুক বিলম্ব করা উচিত না। কোনো ব্যক্তি এমন কাজ করলে আকীদা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কার সৃষ্টি হবে। স্বামী-স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য হলো- সন্তান জন্মলাভের আগে ও পরে এমন পরিবেশ তৈরির সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো, যা সন্তান প্রতিপালনের চ্যালেঞ্জকে কমিয়ে দেবে। এরপর আল্লাহর ওপর নির্ভর করা। তাওয়াক্কুল হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা এবং আল্লাহর নিকট প্রতিনিয়ত ক্ষমা প্রার্থনার সমন্বয়।

'যখন কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো। আল্লাহ তাঁর ওপর নির্ভরশীলদের ভালোবাসেন।'
সূরা আলে ইমরান: ১৫

-পরিবার পরিকল্পনা

গর্ভকালীন অবস্থা নিঃসন্দেহে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সময়। এই সময়টা দম্পতিদের জন্য একই সঙ্গে আনন্দদায়ক এবং ভয়ের কারণ। কেননা, প্রত্যেক পিতা-মাতাই সন্তানের নিরাপদ ও স্বাভাবিক জন্ম প্রত্যাশা করে। তারা এই সময়ে সন্তান জন্মের ব্যাপারে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। তাদের মনে তখন হাজারো সপ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে বাবু কত বড় হলো?আচ্ছা বাবু যখন হবে তখন কে আগে কোলে তুলে নিবে? বাবুর নাম কি হবে?কার সাথে মিল রেখে বাবুর নাম রাখব? ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্তমান সময়ে তো দেখা যায় অনাগত সন্তানের জন্য শপিংও করে রাখতে।

গর্ভাবস্থা এমন এক সময়, যার অভিজ্ঞতা কেবল নারীরাই পায়। শিশুকে গর্ভে ধারণ থেকে শুরু করে জন্মদান পর্যন্ত একজন নারীকে অনেক কষ্ট ও ব্যথা সহ্য করতে হয়। এ কারণেই ইসলামে বাবার থেকে মায়ের মর্যাদা বেশি।

মূলত শিশুর জন্মলাভের পর থেকেই পিতা হিসেবে পুরুষের দায়িত্ব শুরু হয়। কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে গর্ভকালীন অবস্থা অনুভূত করার পর থেকেই অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব আরম্ভ হয় এবং তখন থেকেই তার ত্যাগ-তিতিক্ষা শুরু হয়। গর্ভকালীন মুহূর্ত থেকেই একজন মা শরীরের যত্ন নেওয়া শুরু করে এবং জীবন ধারণের প্রকৃতি ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করে।

এই সময়ে সচেতন পিতা-মাতারা নিজেদের মধ্যে ঠিক সেভাবে চরিত্র ও মূল্যবোধের সমাবেশ ঘটায়, যেভাবে তারা আপন সন্তানকে দেখতে চায়। এই সময়টি তারা কাঙ্ক্ষিত চরিত্রের অনুশীলন এবং সন্তান প্রতিপালনের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করার কাজে ব্যবহার করে। একটি শিশু যে পরিবেশে জন্মলাভকরে, তার একটা প্রভাব শিশুর মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ওপর প্রতিফলিত হয়। যে শিশু এমন পিতা-মাতার কোলে জন্মলাভ করে-যারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, সে শিশুর জীবন ওই শিশুর থেকে উত্তমভাবে শুরু হয়, যার পিতা-মাতা এ সকল কাজ থেকে বিরত থাকে।

পিতা-মাতা যদি সালাত প্রতিষ্ঠা, দান-খয়রাত, কুরআন অধ্যয়ন, নিয়মিত জিকির এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনার মতো কল্যাণকর কাজের প্রতি অভ্যস্ত হতে পারে তাহলে তা কেবল অনাগত শিশুর জন্য আদর্শ পরিবেশই সৃষ্টি করবে না; বরং গর্ভে থাকা শিশুর জন্য বিরাট কল্যাণও বয়ে আনবে। একজন মা যা বলে, যা করে এবং যা চিন্তা করে, তা তার গর্ভে অবস্থিত ভ্রূণকে প্রভাবিত করে এবং তাকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা জোগায়।

শিশুকে গর্ভে ধারণ

গর্ভাবস্থা হলো এমন একটি অভিজ্ঞতা-যার প্রভাব সম্পূর্ণ দেহের ওপরে পড়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে দৈহিক গঠনের তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা না গেলেও গর্ভকালীন কিছু উপসর্গের উপস্থিতি অনেক সন্তানসম্ভবা নারীই টের পেয়ে থাকেন। আর ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ এবং সারা দিন ঘুমের আবেশ আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে-আমাদের শরীর তার গতানুগতিক অবস্থায় নেই। গর্ভাকালীন সময়ে আপনাকে স্বাগত!

গর্ভকালীন প্রথম তিন মাসের দৈহিক পরিবর্তনে আমরা অনেকেই অস্থিরতা বোধ করি। এই অস্থিরতার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে আমাদের আমল আর ইবাদাতে। অসুস্থতার কারণে ফরয সালাতের পর ঠিকভাবে কুরআন কারিম তিলাওয়াত করা যায় না। তিলাওয়াত করলেও তাতে ঠিকভাবে মনোযোগ দেওয়া হয় না। সালাতে লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কিংবা রুকুতে যাওয়ার জন্য স্থান পরিবর্তনের সময় মাথা ঝিমঝিম করে। সাজদায় থাকা অবস্থায় বমি বমি ভাব

হয়। অন্যদিকে, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঘুমানোর ফলে মাঝে মাঝে সালাতের উপযুক্ত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। উপরন্তু কাজের সক্রিয়তা বেশ কম থাকায় সবকিছু শেষ করতেও অনেকটা সময় লেগে যায়।

দৈনন্দিন জীবনের এই পরিবর্তন দেখে মনে হতে পারে যে, আমরা সময় নষ্ট বা আলসেমি করছি। প্রাপ্তির খাতাও শূন্য মনে হতে পারে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে-এই সময়ে ঠিক এটাই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। আমরা গর্ভবতী;-এটা আমাদের স্বাভাবিক দৈহিক অবস্থা নয়।

আমরা পুরোপুরি সুস্থও নই। তাই এ সময়ে দেহের চাহিদাগুলো ঠিকভাবে বুঝতে পারা এবং সেই অনুযায়ী সাড়া দেওয়া আমাদের জন্য আবশ্যক। ভুলে গেলে চলবে না, এটা শুধু নিজের খেয়াল রাখার বিষয় নয়, পাশাপাশি আমাদের ভেতর বেড়ে ওঠা একটা ছোট্ট ও নির্ভরশীল সত্তাকে আগলে রাখাও বটে।

এই সময়ে দেহের চাহিদাগুলো সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়ন করতে হবে; বিশ্রামের প্রয়োজন হলে বসে কিংবা ঘুমিয়ে শরীরকে বিশ্রাম দিতে হবে। আর খাবারের ব্যাপারে বেছে নিতে হবে আমাদের পছন্দের খাবারটাই। কারণ, এটা হলো সুন্নাহ-সম্মত কাজ। তাই মুরগির মাংসের ঘ্রাণ যদি আমাদের অসুস্থ করে ফেলে, তাহলে সেটা না খাওয়াই উচিত এবং এই খেতে না পারা নিয়ে মন খারাপ করা যাবে না। কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ, সেটা আমাদের শরীরই ভালো বোঝে। তাই সেই অনুযায়ী চলা আমাদের কর্তব্য।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোনো খাবার খারাপ বলেননি। খাবার পছন্দ হলে খেয়েছেন, আর অপছন্দ হলে কোনোকিছু না বলে সেটা রেখে দিয়েছেন।
সহিহ বুখারি ৩৫৬৩

একইসাথে মনে রাখতে হবে, আমরা কিন্তু অসুস্থ নই। সুতরাং ইবাদত-আমলের বেলায় কোনোরকম ওজর পেশ করা যাবে না। গর্ভাবস্থা আমল-ইবাদাতের পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং আমল-ইবাদাত চালিয়ে যাওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ। সালাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্মরণ করার জন্য এই নয়টি মাস এক নিয়ামতস্বরূপ। কারণ, এই সময়ে আমাদের ঋতুচক্র সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। তাই কোনোভাবেই একে হেলায় নষ্ট করা যাবে না। দৈহিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার পাশাপাশি আত্মিক উন্নতি লাভের জন্য গর্ভকালীন সময় হলো অতীব

গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামত। অতএব, শারীরিক পরিবর্তনের অজুহাতে ইবাদাত বন্দেগী পরিত্যাগের কথা চিন্তা করা বোকামি ছাড়া আর কিচ্ছু নয়!

গর্ভকালীন সময়টাতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর অপার রহমতের চাদরে আমাদের আগলে রাখেন। অনাগত সন্তানের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, তাই খাবার-দাবারের বিষয়ে এই সময়ে আমরা কতই না সতর্ক থাকি! কিন্তু সব কিছুর ওপরে আমাদের এটাই মনে রাখতে হবে যে-মহান আল্লাহ-ই হলেন একমাত্র হিফাজতকারী। কাজেই আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার মাধ্যমে আমাদের নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং গর্ভের সন্তানের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এই সময়টি মহান আল্লাহকে ভুলে থাকার সময় নয়; বরং আমরা যদি আল্লাহ তাআলাকে মনে রাখি, তবে নিশ্চিত থাকতে পারি যে তিনিও আমাদের মনে রাখবেন। কুরআন কারিমে ঘোষিত হয়েছে-

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ .

সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।
সূরা বাকারাহ:১৫২

শিশু গর্ভাবস্তায় বাবা মায়ের নিয়ত:

নিয়ত অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে "মানুষের সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে"।
সহীহ বুখারি
নিয়তের অনেক তাছির রয়েছে। গর্ভাবস্থায় মাতা-পিতা যেমন নিয়ত করবে নবাগত সন্তানের উপর তার প্রভাব অবশ্যই পড়বে। সুতরাং সন্তান সম্ভবা হওয়ার পর প্রত্যেক মাতা-পিতার নিয়ত ঠিক করে নেয়া উচিত। যেহেতু আপনি মুসলমান তাই আপনার নিয়তও এই হওয়া উচিত যে, আমার সন্তানকে প্রথমে পাক্কা মুমিন বানাব এবং তা বানাতে যা কিছুর প্রয়োজন সবই করব, তাতে কারো কোন কথায় কান দিব না। কারন, সন্তানকে সুশিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুললে তার সুফল উভয় জগতে আপনিই ভোগ করবেন। পক্ষান্তরে কু-শিক্ষায় শিক্ষিত করে কুচরিত্রের অধিকারী করে সমাজের বোঝা বানালে তার অশুভ পরিণতি উভয় জগতে আপনাকেও ভোগ করতে হবে। তাই সন্তানের জন্য মাতা-পিতার এই নিয়ত থাকাই বাঞ্চনীয় যে, আমার সন্তানকে কুরআনের হাফেজ বানাবো, আলিম বানবো, দ্বীনের দাঈ বানাব ইত্যাদি। যাতে করে

সে আমার উভয় জগতেই কাজে আসে। কোন মুসলমান মাতা-পিতার অন্তরে কখনো এমন নিয়তের স্থান দেয়া উচিত নয় যার মধ্যে পার্থিব ও পরকালীন কোন উপকার নেই।

মায়ের বিশেষ সতর্কতা:

আপনি যদি সত্যিকারার্থেই একজন আদর্শ সন্তানের আদর্শ মা হতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, আপনি এখন আর পূর্বের মতো একা নন; বরং আপনার গর্ভে শত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফল আদরের ফুটফুটে বাচ্চাটি লালিত-পালিত হচ্ছে। আপনার কাজকর্ম, চলাফেরা, চাল-চলন, আচার ব্যবহার, কথাবার্তা, নম্রতা, ভদ্রতা, শালীনতা, অশালিনতা, শিষ্টাচারিতা, চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণই আপনার গর্ভে ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় শিশুর সহজাত স্বভাবে তা রেখাপাত করে এবং তা অবিচ্ছিন্ন প্রভাবের রেশ রেখে যায়। সুতরাং আগের মতো লাগামহীন চলাফেরা, শ্বাশুড়ী বৌমার ঝগড়া, ননদ-ভাবীর তিক্ততা, টি.ভি. মোবাইল , গীবত শেকায়েত, চোগলখুরী, মিথ্যাকথা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, মোটকথা, সব ধরণের গুনাহ ও অন্যায়, অশুভ কাজ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। কেননা, আপনার এই বদ আখলাকের কু-প্রভাব সন্তানের উপর অবশ্যই পড়ে।

পক্ষান্তরে বেশী বেশী ইবাদত বন্দেগী ও সৎকাজে সময় ব্যায় করতে হবে। ফরয-ওয়াজিব আদায়ের পাশাপাশি নফল ইবাদত অর্থাৎ নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ ও যিকিরের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করতে হবে। তাহলে মায়ের এই সৎ কাজের সু-প্রভাব সন্তানের উপর অবশ্যই পড়বে। এ পৃথিবীতে যত বড় বড় ওলী আল্লাহ, বুযুর্গানে দীন, পীর-মাশায়েখ জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে তাদের মায়ের আমল আখলাক জ্ঞান-গুণের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। যে মা সন্তানকে গর্ভে নিয়ে নামায পড়বে ইনশাআল্লাহ তার সন্তানও নামাযী হবে। যে সন্তান গর্ভে নিয়ে বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াত করবে সে সন্তানও কুরআন শিক্ষায় ধন্য হবে। যে মা সন্তান গর্ভে নিয়ে তাহাজ্জুদ, আওয়াবীন, ইশরাক, চাশতসহ অন্যান্য নফল ইবাদতে অভ্যস্ত হবে তার সন্তান ও ইনশাআল্লাহ ঐ সমস্ত নফল ইবাদতে অভ্যস্ত হবে। ঠিক তেমনিভাবে যে মহিলা গর্ভে সন্তান নিয়ে মিথ্যা, গীবত, ধোকাবাজি, ফাকিবাজি, ইত্যাদি নাযায়েয কাজ থেকে বিরত থাকবে সন্তানও ইনশাআল্লাহ ঐ সমস্ত অন্যায় ও অশুভ কাজ থেকে বিরত থাকবে।

নতুন মেহমানের আগমন

যার জন্য আমাদের অযুত রাত্রি, নিযুত প্রহরের অপেক্ষা, অবশেষে সে এলো, আলহামদুলিল্লাহ! জীবনে এর চেয়ে পরম আনন্দময় মুহূর্ত খুব কমই আসে। এতদিনকার স্বপ্ন, কল্পনা-জল্পনা, গল্পের ডালাপালা যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো, সেই অঙ্কিত মুখখানা আজ আমাদের সামনে

বাস্তবে উপস্থিত। কী সুন্দর পিটপিট চোখে সে তাকাচ্ছে! কী নরোম, তুলতুলে গা! কাঁদলে কী যে মায়া লাগে! আহা! আমার প্রিয় সন্তান, তোমাকে স্বাগত এ ভুবনে!

নতুন অতিথি আগমনের খুশির সাথে দুনিয়ার আর কোনো খুশির তুলনা হবে না।

"যখন কোনো পরিবারে নতুন সন্তান জন্যগ্রহণ করত, তখন আয়িশা (রা) একথা জিজ্ঞেস করতেন না সন্তানটি ছেলে নাকি মেয়ে; বরং তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে কি সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ?" যখন তাঁকে ইতিবাচক উত্তর দেওয়া হতো, তখন তিনি বলতেন-'সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার প্রতি।'

বুখারি

সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের প্রথম দর্শন এমন এক অপ্রকাশযোগ্য অভিজ্ঞতা, যা কেউ ভুলতে পারে না। অন্যরা যা-ই বলুক না কেন, ছোট্ট শিশুর জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হলো মায়ের আঁচল, ভালোবাসা ও বুকের দুধ। মায়ের ভালোবাসা প্রদানের সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো-সন্তানের সাথে নিজের শরীরের সংযোগ ঘটিয়ে সব সময় কাছে থাকা। এর মাধ্যমে শিশুর সবচেয়ে অসহায় পরিস্থিতিতে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়।

প্রতিটি শিশুর জন্ম আল্লাহর অলৌকিকত্বের নিদর্শন। একটি অন্তর যখন জীবনের যাত্রা শুরু করে, তখন তা যেকোনো কিছু গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। এটি এমন একটি অবস্থা, যা আমাদের অসহায়ত্বের কথা এবং এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয়, এইভাবে আমরাও জীবনের যাত্রা শুরু করেছিলাম। আল্লাহর অনুগ্রহে এবং আমাদের পিতা-মাতার প্রচেষ্টার ফলে এই জীবন চক্রে আমরা টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছি। সন্তান ভূমিষ্ঠের সময়টি এমন এক মুহূর্ত, যা আমাদের আল্লাহর সামনে মাথা নত করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে বাধ্য করে। এই মুহূর্তটি পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের আকাঙ্ক্ষাকে আরও দৃঢ় করে। তবে, তার আগমনকে কেন্দ্র করে কয়েকটা দায়িত্ব ইসলাম আমাদের ওপর অর্পণ করেছে। আনন্দের জোয়াড়ে আমরা যেন সেই দায়িত্ব ভুলে না যাই।

নতুন মেহমান আগমনের পর পিতা মাতার দায়িত্ব

-আযান:

নবাগত শিশু সম্পর্কে ইসলাম যে নীতিমালা ও দিক নির্দেশনা দিয়েছে তন্মধ্যে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পাক সাফ করার পর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আমি দেখতে পেলাম যখন হযরত ফাতিমা (রা.) এর ঘরে হাসান

(রা.) জন্মগ্রহণ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কানে আযান দিলেন।
-আবূ দাউদ, তিরমিযী

অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কারও সন্তান জন্ম নিলে তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিলে ঐ শিশুকে জিনের আছর বা মৃগী রোগে স্পর্শ করতে পারবে না।

এই আযান ও ইকামতের উপকার ও রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (র.) 'তুহফাতুল মওদূদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, নবাগত শিশুর কানে আযান ও ইকামত বলার রহস্য এই যে, মানুষের কর্ণ কুহরে সর্ব প্রথম আল্লাহর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের আওয়াজ ধ্বনিত হোক এবং প্রবেশ করুক তার সদ্য মস্তিষ্কে সেই পবিত্র কালিমার আওয়াজ যার দ্বারা মানুষ মুসলমানিত্বের গৌরব অর্জন করে। এ ছাড়া হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী আযানের আওয়াজ শুনে শয়তান পালায়, সেটাও একটি মস্তবড় ফায়দা। কেননা, শয়তান পূর্ব থেকেই শিশুকে বিভ্রান্ত করার জন্য কাছে এসে থাকে। আযান ও ইকামতের ধ্বনিতে তার সেই আশা নিরাশায় পরিণত হয়।

-তাহনীক:

নতুন সন্তানকে কোনো দ্বীনদার বুজুর্গ ব্যক্তির মাধ্যমে সামান্য পরিমাণে খেজুর চিবিয়ে খাওয়ানো কে তাহনীক বলে। এতে সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুর জীবন মিষ্টান্নের সাথে শুরু হয়।
আয়িশা (রা:) বলেন-
সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুদের রাসূল-(সা:)এর নিকট আনা হতো। তিনি শুরুতে তাদের কল্যাণের জন্য দুআ করতেন, তারপর তাদের মুখে চর্বিত খেজুরের টুকরো ঘষে দিতেন।'
মুসলিম, আবু দাউদ

-মাথার চুল কাটা:

রাসূল (সা:) সাধারণত জন্মের সপ্তম দিন শিশুদের মাথা সম্পূর্ণ মুণ্ডন করতেন। তারপর ফেলে দেওয়া চুল ওজন করে সমপরিমাণ সম্পদ দান করতেন। হাদিসে শরীফে এসেছে, হাসান (রা:)এর জন্মের পর নবিজি (সা:) ফাতিমা(রা:)-কে বলেন-

“তাঁর চুল কামিয়ে ফেলো এবং এই চুল রুপার সাথে মেপে তা গরিবদের দান করো। তাই তিনি তাঁর চুল কামিয়ে ফেলেন, তারপর এটিকে মাপেন-যার ওজন ছিল এক দিরহাম কিংবা এক দিরহামের কিছু অংশের সমান।'

আহমাদ ও বায়হাকি

-আকিকা:

নবাগত শিশুর আকিকা করা সুন্নত। এটি জন্মের সপ্তম দিনে সম্পন্ন করা উচিত। তবে কেউ যদি পরে করে তাও আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ । ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ছেলেদের জন্য দুটি এবং মেয়েদের জন্য একটি বকরি কুরবানি করা। সন্তানের জন্ম যেহেতু আনন্দ তৈরি করে, তাই এ উপলক্ষ্যে বন্ধু-বান্ধব ও নিকটাত্মীয়দের আমন্ত্রণ করা উচিত।

“প্রত্যেক শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে তার আকিকা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ তার জন্ম উপলক্ষ্যে পশু কুরবানি দেওয়া। একই দিনে নাম রাখা এবং মাথা মুণ্ডন করা।”

আবু দাউদ ও আহমদ

“যে ব্যক্তি সন্তান লাভ করে এবং সে তার জন্য কিছু উৎসর্গ করতে চায়, সে যেন পুত্র সন্তানের জন্য দুটি এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরি কুরবানি দেয়।”

আবু দাউদ ও নাসায়ি

“প্রত্যেক শিশুর জন্য আকিকা দেওয়া উচিত। সুতরাং তার জন্য রক্ত প্রবাহিত করো এবং তার থেকে সকল ধরনের অকল্যাণ বিতাড়িত করো।”

বুখারি,আবু দাউদ, তিরমিজি

-নাম রাখা:

সপ্তমদিন সুন্নত গুলোর মধ্যে একটি হলো নাম রাখা। পিতা-মাতার কর্তব্য যখন বাচ্চার বয়স সপ্তম দিনে পৌঁছে কোন বুজুর্গ আলেম দ্বারা বাচ্চার জন্য দু'আ করিয়ে ভাল ইসলামী নাম রাখবে। আমাদের নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

كُلُّ غُلَامٍ رَهِ بِهِ رأسه : يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسمى فِيهِ وَيَحْلِقُ بِعَقِيقَتِه ذبح

“অর্থাৎ, প্রত্যেক শিশু তাঁর আকীকার সঙ্গে বন্ধক রাখা। সপ্তম দিবসে তার পক্ষ থেকে প্রাণী জবেহ করবে এবং ঐ দিনেই তার নাম রাখবে। তার মাথা মুন্ডিয়ে দিবে।”

-তিরমিযী শরীফ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন,

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَاءِ كُمْ وَبِاسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَاحْسِنُوا أَسْمَاءَ كُمْ

"তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন তোমাদের এবং তোমাদের পিতা-মাতার নাম ধরে ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা ভাল নাম রাখ।"
-আবূ দাউদ শরীফ

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَاءِ كُمُ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ

"তোমাদের নাম সমূহের মধ্য থেকে আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান নাম আল্লাহর নিকটে অধিক প্রিয়।"
-মুসলিম শরীফ

-ছেলে বাচ্চা হলে খৎনা:

সুন্নতে খৎনা এমন একটি বিধান, যা ইবরাহিম (আ:)-এর সুন্নাহ থেকে এসেছে। অনেকেই জন্মের সপ্তম দিনেই সুন্নতে খতনা সম্পন্ন করতে বলেন। আবার কেউ কেউ শিশুর প্রথম দাঁত পড়ে যাওয়ার পর খতনা করার পরামর্শ দেন। নিম্নোক্ত হাদিস মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচ্ছন্ন করার গুরুত্ব বর্ণনা করে। তবে এর সাথে নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

"মানুষের ফিতরাত (সহজাত প্রবৃত্তি) পাঁচটি-খতনা, গোপনাঙ্গের চুল পরিষ্কার করা, গোঁফ ছোটো করা, নখ কাটা এবং বগলের চুল পরিষ্কার করা।"
বুখারি ও মুসলিম

-বাচ্চাকে মায়ের দুধ খাওয়ানো:

সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী শিশুকে মায়ের দুধ পান করানো এটা যেমনিভাবে মায়ের উপর সন্তানের একটি হক তদ্রুপ এটি মাতৃত্বের চাহিদাও বটে। সন্তানকে মায়ের দুধ পান করানো আমাদের সমাজের একটি সু-প্রসিদ্ধ নিয়ম এবং প্রত্যেক মায়ের এটাকে আন্তরিক ও প্রাকৃতিক দায়িত্ব মনে করা উচিৎ, কিন্তু আফসোস এর বিষয় হচ্ছে বর্তমান সময়ের মায়েরা সন্তানকে দুধ খাওয়াতে রাজি নন বললেই চলে। তারা মনে করেন এতে তাদের শরীরের সৌন্দর্য নষ্ট হবে। যারা এমন মানসিকতা পোষণ করে তাদের কাছে প্রশ্ন   ত্যগ স্বীকার না করলে কি আদর্শ মা হওয়া যায়? শিশুর জন্য মায়ের দুধ একটি পরিপূর্ণ পুষ্টিকর খাদ্য,এটা চিকিৎসা এবং শরীয়ত উভয় দিক থেকেই প্রমানিত । সদ্য জন্মানো শিশুর উপকারের জন্য যা কিছু প্রয়োজন মায়ের দুধের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই দিয়ে দিয়েছেন। এতে শিশুর মন-মস্তিষ্ক, স্বাস্থ্য-শরীর, মেধা সবকিছুই ভাল থাকে এবং বিভিন্ন রকমের রোগ ব্যাধি হতে মুক্ত থাকে। পক্ষান্তরে কৌটাজাত, বোতলজাত গুড়ো দুধ অনেক ক্ষেত্রে শিশুর সাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করে। অনেক সময় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য শরীর ভেঙ্গে যায়। তাই মায়ের দুধের প্রাচুর্য থাকতে ঐ সমস্ত কৃত্রিম দুধের খোজ না করাই উত্তম। নিঃসন্দেহে মায়ের দুধ শিশুর জন্য শুধুমাত্র কুদরতী উত্তম খাদ্যই নয়; বরং মায়ের পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য সর্বোত্তম উপহার।

রুকইয়া করা:

রুকইয়া একটি শরিয়তসম্মত চিকিৎসা, এটা সুন্নাহ।রাসুলুল্লাহ (সা:) ছোট, বড় সকলকে রুকইয়া করতে বলেছেন। বাচ্চারা নাপাক থাকলে শয়তান আক্রমন করে।বাচ্চাকে ভয় দেখায়।আল্লহর কালাম বললে শয়তান ক্ষতি করতে পারবেনা। সেজন্য বাচ্চারা অসুস্থ হলে আগেই ডাক্তার নয় সবার আগে আল্লাহর কালাম দ্বারা তারপর সদকা দ্বারা,তারপর ডাক্তার এর দ্বারা চিকিৎসা করা উচিত।

তাদের অসুস্থতায় শয়তান কষ্ট দেয়। বাচ্চাদের বদনজরের সমস্যা বেশি হয়, এজন্য মাঝে মাঝে দেখা যায় যে বাচ্চারা অতিরিক্ত দুষ্টামি করে,খাবার খেতে চায়না, অসুস্থ হয়ে পরে । তাই মাসে ১/২ বার রুকইয়াহ করানো উচিত।

সন্তান আমার কাছে আল্লাহর দেয়া আমানত

'ওহে বিশ্বাসীরা। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সীমালঙ্ঘন করো না।

-সূরা আনফাল: ২৭

মাতা পিতার কাছে সন্তান কত প্রিয় তা বোঝানোর যোগ্যতা সম্ভবত কোনো মানুষের নেই। ভালোবাসার চূড়ান্ত পরিসীমা বুঝাতেই মানুষ সন্তানের ভালোবাসার উপমা দিয়ে থাকে। এক আরব বেদুঈন কতইনা চমৎকার বলেছে,

“আমার সন্তান তো আমার নিজের কলিজাটিই, যা বক্ষ থেকে বের হয়ে জমিনে চলাফেরা করছে।”

কিয়ামত দিবসের বিভীষিকা বুঝাতে আল্লাহ তাআলা সন্তানের ভালোবাসার কথা দিয়েই বুঝিয়েছেন যে, সন্তান এত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও সেদিন পিতা মাতার সন্তানেরও খোঁজ রাখার সুযোগ হবে না। মা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসার সীমা বুঝাতেও কুরআন-হাদীসে সন্তানের এ ভালোবাসা দিয়েই বুঝানো হয়েছে যে, স্বীয় সন্তান থেকেও তাদেরকে বেশি ভালোবাসতে হবে। জোড়াবদ্ধ হওয়ার পর প্রতিটি জোড়ার এটাই আকাঙ্ক্ষা থাকে যে তাদের কোল জুড়ে নতুন কেউ আসবে। ফুটফুটে চেহারায় স্বচ্ছ কোমল অন্তর নিয়ে হাসবে। একটু বিলম্ব হলে প্রতীক্ষার প্রহর যে আর শেষ হয় না। অস্থির হয়ে যায়, কখন নতুন মুখটি আসবে। আর যখন সে দুনিয়াতে আসে ঘরের সবাই তো খুশিই, তবে মাতা-পিতার যে কী পরিমাণ খুশি তা বলে বুঝানো সম্ভব নয়।

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে পিতা-মাতার প্রতি আমানতস্বরূপ। অন্যকথায়, সন্তানদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ পিতা-মাতার ওপর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি পিতা-মাতাকে নির্দেশনাও দিয়েছেন উপযুক্ত উপায়ে সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাতে। খুব স্বাভাবিকভবেই এই আমানতের খেয়ানত করার অর্থ হলো-আল্লাহর দেওয়া আমানতের খেয়ানত করা। আমরা যদি নিজেদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যয় করে সন্তান প্রতিপালনের কাজটি সম্পাদন করতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধির আশা পোষণ করি, তবে সর্বাগ্রে সন্তান লালন-পালনের প্রকৃতি, এর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে ধারণা লাভ করতে হবে।

দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের জন্য জীবনে কোন কোন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, তা বিবেকবান মুসলিম মাত্রই অনুধাবন করতে পারে। তবুও তাদের উপলব্ধিতে এই বিষয়টি থাকা উচিত-সন্তানের সুন্দর জীবনের জন্য কেবল খাদ্য, বস্ত্র ও জাগতিক সামগ্রীই যথেষ্ট নয়; বরং নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের গড়ে তোলাও আবশ্যক। যাতে তারা সমাজের একজন ভালো মানুষ ও আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে।

সন্তান প্রতিপালন পদ্ধতি মূলত তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যানকর বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, যা পিতা-মাতার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ এবং পরকালীন জীবনে ভালো ফলাফল অর্জন নির্ভর করে সন্তান প্রতিপালনে সফল হওয়ার ওপর।বান্দা পরকালে নিজের মর্যাদাকে সমুন্নত অবস্থায় দেখে বলবে-

“হে আল্লাহ! আমি এই মর্যাদার অধিকারী কীভাবে হলাম?' আল্লাহ বলবেন-'মৃত্যুর পর তোমার সন্তানরা তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, সে কারণে তুমি এই মর্যাদার অধিকারী হয়েছ।”
আহমাদ ও ইবনে মাজাহ

সন্তান প্রতিপালনের পুরস্কার যেমন বিশাল, তেমনি এর ব্যর্থতার শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর। একজন শিশুর যত্নের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার, বিশেষত মায়ের শারীরিক উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান বড়ো হওয়ার সাথে সাথে পিতা-মাতার মাঝে শঙ্কা বাড়তে থাকে; তার স্বাস্থ্য, পড়াশোনা ও বিভিন্ন সামাজিক বৈরী পরিস্থিতিতে টিকে থাকার সক্ষমতা নিয়ে। এই শঙ্কা বা উদ্বেগ অমূলক নয়; কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে সচেতন পিতা-মাতার মনে রাখতে হবে, আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্যই। তাই সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পেরেশানি যেন আমাদের আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ করতে না পারে, সে ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে।

“ওহে, যারা বিশ্বাস করো! তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে না সরিয়ে দেয়।যে ব্যক্তি তা করবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।”
সূরা মুনাফিকুন: ৯

একজন বিশ্বাসী নিজ সন্তানের থেকে প্রাপ্ত সকল পরিতুষ্টি ও দুঃখের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

সন্তান পালন এ যেন এক বিরাট দায়িত্ব

সন্তান প্রতিপালন মানে কেবল পিতৃত্ব কিংবা মাতৃত্ব নয়। পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব শুধু শারীরিক প্রক্রিয়ার ফলাফল, কিন্তু সন্তান প্রতিপালন হচ্ছে জীবন প্রক্রিয়ার একটি সচেতন কার্যক্রম। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া-যেখানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আরেকজন নবাগত অপরিপক্ব মানুষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচর্যা এবং তার উন্নতি সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ

করে। তাই সন্তান প্রতিপালনের জন্য মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা প্রয়োজন। কারণ, প্রত্যেক অভিভাবককে একই সঙ্গে একজন শিক্ষক, পরামর্শক ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশকের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

পিতা-মাতাও মানুষ, প্রকৃতিগত কারণে তাঁদেরও অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতার কারণে কোনো পিতা-মাতাই সন্তান প্রতিপালনে শতভাগ সফল হতে পারে না। আর সন্তান প্রতিপালনের এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে কোনো পিতা-মাতাই বিচার দিবসে পাকড়াও হবে না। পিতা-মাতাকে এই ব্যাপারে আরও সচেতন হওয়া উচিত। কেননা, তাদের ভঙ্গুর কাঁধে অর্পিত হয়েছে আল্লাহর প্রতিনিধি প্রতিপালনের ভারী বোঝা।

পরিবার হচ্ছে পৃথিবীর ভেতর আরেকটি ছোটো পৃথিবী; যেখানে আল্লাহর দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে দায়িত্ব পালন এবং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এখানে পারস্পরিক ভালোবাসা, আন্তরিকতা, আপস, সম্মানসহ বিভিন্ন মানবিক বৈশিষ্ট্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে।

ব্যক্তি নয়; একটি সমাজ গড়ে উঠে পরিবারের ওপর ভিত্তি করে। নতুন শিশুর জন্মের সাথে সাথে একটি নতুন পারিবারিক ইউনিট গড়ে ওঠে। অভিভাবকের কর্তব্য হলো-নিজের সক্ষমতাকে পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে ব্যয় এবং এমন একটি পারিবারিক পরিবেশ তৈরি করা, যাতে সন্তানরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করতে পারে।

সন্তান লালন-পালনে সওয়াবের আশা করা

ইহতিসাব অর্থ হলো-নেক কাজের নিয়ত করা এবং এর জন্য যাবতীয় কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ তাআলার ওয়াদাকৃত সওয়াব লাভের প্রত্যাশা করা।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনুল আছীর রাহিমাহুল্লাহু এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ইহতিসাবের অর্থ হলো-সওয়াব অন্বেষণের প্রতি সচেষ্ট হওয়া এবং ধৈর্য ও একনিষ্ঠভাবে নিজেকে সঁপে দেয়ার মাধ্যমে তা অর্জন করা অথবা নেক কাজের ধরণ ব্যবহার করা এবং কাঙ্ক্ষিত সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাজ শুরু করা।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'সমস্ত কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই হবে, যে জন্যে সে হিজরত করেছে।'

আপনার কাছে এটা অস্পষ্ট নয় যে, সন্তান লালন-পালন কতটা কষ্টের হয়ে থাকে! তবে এটা অসম্ভব কিছু না। সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে সওয়াবের আশা করা এবং আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা চাই। তাহলে আল্লাহ তাআলা তা আপনার জন্য সহজ করে দিবেন। আপনার সহযোগী হবেন। আপনি হবেন অঢেল সওয়াবের অধিকারী। সন্তান লালন-পালন করে সওয়াব পেতে হলে অবশ্যই নিয়তের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। কারণ এর দ্বারা অন্তরে সর্বদা আল্লাহ তাআলার বিরাজমানতা বিদ্যমান থাকে। নিয়তের প্রতি আগ্রহ কাজকে আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠ করে দিবে।

কথার চেয়ে কাজ কঠিন

সন্তান প্রতিপালনের এই পথ অনেক উত্থান-পতন, অপ্রত্যাশিত ঘটনা ও চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ, যা অভিভাবক-সন্তান উভয়ের ব্যক্তিত্ব গঠনে ভূমিকা রাখে। সৎ ও আত্মসচেতন পিতা-মাতা নিজদের ওপর প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার গড়িমসির আশ্রয় দেয় না। অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে তারা দৃঢ় ও সুপরিকল্পিত উপায়ে নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। সুষ্ঠু পরিকল্পনাহীন সন্তান প্রতিপালন যেন অচেনা ভূখণ্ডে কোনো প্রকার ম্যাপ বা পথনির্দেশিকা ছাড়া ভ্রমণ করার নামান্তর।

পিতা-মাতা পরস্পরের পরিপূরক দক্ষতা ও স্বভাবের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, যা সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। কিছু কাজ মায়ের জন্য সহজ, কিছু কাজ বাবার জন্য সহজ। সন্তান প্রতিপালনের পুরো কাজটি পিতা-মাতা উভয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাধিত হয়। পিতা-মাতা উভয়ের লক্ষ্য একই গন্তব্যের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য উভয়ের সমন্বিত পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেবল সমন্বিত পরিকল্পনার অভাবে পরিবারে মতপার্থক্য ও সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হতে পারে।
একটি প্রবাদ আছে,,,,,,,

"যদি প্রস্তুত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন, তবে ব্যর্থতার জন্য প্রস্তুত হন।"

আমাদের কার্যক্রম এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এই প্রবাদটির যথার্থতা রয়েছে।
আমরা শিক্ষকদের কাছে প্রত্যাশা করি, তারা যেন সন্তানদের পাঠদানের জন্য পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির পেছনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করে। কিন্তু সন্তানকে যথাযথভাবে গড়ে তোলার জন্য নিজদের সময় দেওয়ার কথা বেমালুম ভুলে যাই! সন্তান প্রতিপালনের সর্বোচ্চ ফলাফল লাভের জন্য এবং সুপ্ত সম্ভাবনা বিকাশের জন্য সচেতন পিতা-মাতা নিজেদের সার্বিক ধ্যান-জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা এর পেছনে ব্যয় করে। কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনে তারা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

তারা কোনো ভুল করবে না-এমনটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। আমরা সবাই ভুল করি, কিন্তু চিন্তাশীল অভিভাবক নিজেদের সীমাবদ্ধতাগুলো খুব স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করে এবং সন্তান প্রতিপালনের পুরো প্রক্রিয়া থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তারা সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এমন পন্থা অবলম্বন করে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সমস্যাকে হ্রাস করে এবং পরিবারে স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রাখে।

রাসূলে কারীম (সা:) বলেন-
“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।”
বুখারি ও মুসলিম

শিশুর চাই একজন দক্ষ অবিভাবক

অভিভাবকদের নিকট সন্তান পরিচর্যা ও প্রতিপালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তবে কখনও তাদের অবস্থা ও ব্যস্ততা নিজ সন্তানদের যত্ন ও প্রতিপালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। তাই যাদের আর্থিক সচ্ছলতা রয়েছে তারা নিজের সন্তানদেরকে অনর্থক ছেড়ে না দিয়ে তাদের জন্য একজন অভিভাবক ও শিষ্টচার শিক্ষাদানকারী নিযুক্ত করে দেবেন।

আগের যুগের মুসলমানরা তাদের সন্তানদের জন্য অভিভাবক ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারী নিযুক্ত করতেন। প্রতিপালন বিষয় তাদের নিকট প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে হতে ইবনে খালদুন যা উল্লেখ করেছেন তাও রয়েছে। তিনি বলেন, 'শিক্ষাদানের সর্বাপেক্ষা উত্তম পদ্ধতি সেটাই যা হারুন রশীদ তার সন্তানদের জন্য উপস্থাপন করেছেন। আহমারের প্রতিনিধি বললেন- 'আমার নিকট হারুন রশীদ পাঠালেন তার ছেলে মুহাম্মাদ আল আমীনকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। অতঃপর হারূন রশীদ বললেন- হে আহমার! আমিরুল মু'মিনীন তার প্রাণশক্তি ও হৃদপিণ্ডের ফল তোমার প্রতি

অর্পণ করেছেন। সুতরাং তার প্রতি তোমার হাত সম্প্রসারিত করে রাখো। তোমার আনুগত্য করা তার কর্তব্য। তুমি তার সঙ্গে এরূপ হয়ে যাও যেন আমিরুল মু'মিনীন তোমাকে নিজের দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন।' তাকে কুরআনে কারীমের পাঠ শিক্ষা দাও। ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করাও।

কবিতা আবৃতি ও হাদিস শিক্ষা দাও। হাদিসের সূচনা ও অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট দেখাও। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যখন তার কাছে আসবে তাদের মর্যাদা দিতে বল। তোমার কাছ থেকে যেন এক মুহূর্তও অনুপস্থিত না থাকে। তাকে কোনরূপ দুশ্চিন্তায় ফেলবে না যাতে শিশুর কচি মনটা মরে যায়। তাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করবে না। ফলে যখন অবসর পাবে তখন তা করা শুরু করবে যা সে পছন্দ করে।

উতবাহ বিন আবু সুফিয়ান তার সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারী আব্দুস সামাদকে বলেন,

"কোনো শিশু-সন্তানের সংশোধনের পূর্বে তোমার নিজের সংশোধন করে নেয়া উচিত"
কারণ শিশুদের চক্ষুসমূহ আপনার চক্ষুর সঙ্গে আবদ্ধ। কাজেই আপনি যা উত্তম মনে করবেন তা-ই ওদের নিকট উত্তম। আর আপনি যা মন্দ মনে করবেন তা-ই ওদের কাছে মন্দ

মহৎ কিছুর প্রস্তুতি

ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হলো-এমন একটি পৃথিবী তৈরি করা, যেখানে মানবজাতি হবে সকল ধরনের অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত। আর এটার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হবে সবার অন্তরগুলোকে শিক্ষিত ও মুক্ত করা।
একসময় ইসলাম পালনের অর্থই ছিল জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করা। সর্বক্ষেত্রেই মুসলিমরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ইসলাম এই ব্যাপারে পরিষ্কার নির্দেশনা দিয়েছে, যাতে মুসলিমরা বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত হয়।ইতিহাসের পাতায় চোখ বোলালে দেখা যায় মুসলিমরা সারা বিশ্বে শাসকের ভূমিকায় ছিল; যদিও তাদের জনসংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। তারা একদিকে সন্তানদের কাছে, অন্যদিকে পুরো সমাজের কাছে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। আসমানি ওহীর ভিত্তিতে তারা এমন একটি সভ্যতার সীমানা বিস্তৃত করেছিল, যেখানে কোনো ধরনের জোর-জবরদস্তি ছিল না।তখনকার মুসলিমদের চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অন্যান্য সকল ধর্মের নারী পুরুষ ও শিশু দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইসলাম ওই মানুষদের অন্তরে প্রশান্তি জুগিয়েছে এবং সমাজব্যবস্থায় পারস্পরিক সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের ইতিবাচক পরিবর্তনে আগ্রহী করে তোলা। সন্তানরা যেন সমাজে আত্মবিশ্বাসের সাথে চলতে পারে, সেজন্য পিতা-মাতার উচিত তাদের জন্য স্থিতিশীল ও ভালোবাসায় পূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ নিশ্চিত করা। এই ক্ষেত্রে সন্তানদের দ্বীন ও দুনিয়ার জ্ঞান শিক্ষা দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে তাদের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা আমাদের দায়িত্ব। এটি এমন লক্ষ্য, যা দুনিয়াবি মান-মর্যাদা ও অর্থ-বিত্তের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে অল্পতে তুষ্ট হতে শেখাবে।

আমার সন্তানকে কীভাবে গাইড করব?

প্রতিটি মা-বাবাই চান তাদের সন্তানরা ভাল হোক, সঠিক পথে থাকুক, তারা ইসলামী মনমানসিকতার হোক। কিন্তু আমাদের এই চাওয়াটা শুধু "One way", অর্থাৎ আমরা মা-বাবারা সবাই চাই সন্তান ভাল হোক কিন্তু আমরা নিজেদের ভাল হওয়ার ব্যাপারে তেমন সচেতন এবং সচেষ্ট নই। আমরা নিজেরা যেভাবে ইচ্ছে চলবো, যেখানে ইচ্ছে যাবো কিন্তু সন্তানদের বেলায় চাই বিনা চেষ্টাতেই তারা সঠিক পথে চলুক যা কখনো সম্ভব নয়।

মাটি যখন নরম থাকে তখন তা দিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমন পাত্র তৈরী করা যায়। কিন্তু মাটি শক্ত হয়ে গেলে তখন তা দিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমন পাত্র তৈরী করা খুবই কঠিন। পাত্র যদিও তৈরী করা যেতে পারে সেজন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। তাই আমাদের সন্তান যখন কম বয়সের থাকে তখন থেকেই উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বড় হয়ে গেলে এই পরিবেশে সঠিক পথে নিয়ে আসা খুবই কঠিন। যাদের সন্তান বড় হয়ে গেছে তাদের তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

উদাহরন ১:

টরন্টোর একটি বাস্তব ঘটনা। একটি ইসলামিক প্রোগামে মা তার ক্লাস নাইনে পড়ুয়া মেয়েকে নিয়ে এসেছেন কিছু ইসলামী কথা শুনানোর জন্যে। প্রোগ্রাম চলছে কিন্তু এক মুহূর্তে এসে ঐ মেয়ের আর এসব কুরআন-হাদীসের কথা ভাল লাগছে না। সে কোনভাবেই বসে থাকতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে দুই হাত দিয়ে নিজের দুই কান চেপে ধরে বসে আছে যেন ইসলামের কথা শুনতে না হয়। এখানে মেয়ের কোন দোষ নেই, কারণ সে ছোটবেলা থেকে এই ধরনের কোন কথা শুনেনি। তাই তার কাছে কুরআনের কথাগুলো ভাল লাগছে না, অসহ্য মনে হচ্ছে। এখানে দোষ মা-বাবার।

উদাহরণ ২:

এটিও টরোন্টর একটি ঘটনা। একটি পরিবার তার সন্তানদের ইসলামের কথা শুনানোর জন্য তার নিজের বাসায়ই একদিন ইসলামিক প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন। ড্রইংরুমে প্রোগ্রাম চলছে কিন্তু বাড়িওয়ালার হাইস্কুলে বা কলেজে পড়ুয়া ছেলেটি প্রোগ্রামে না বসে নিজের রুমে বসে আছে। বাবা বারবার তাকে ডাকছেন কিন্তু আসছে না। এক সময় বাবা ছেলের এক বন্ধুকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন ছেলেকে আনতে। ছেলেটি এবার এসে সকলের সামনে বাবাকে একটি ধমক দিয়ে বলে গেল "বারবার ডাকছো কেন"? তারপর সে প্রোগ্রামে না বসে আবার তার রুমে চলে গেল, বাবা কিছুই বলতে পারলেন না। এই ঘটনায়ও সন্তানের কোন দোষ নেই, সে ছোটবেলা থেকে ইসলামিক গাইড পায়নি। এখন তাকে জোর করে একদিন ইসলামিক প্রোগ্রামে বসিয়ে অ্যান্টিবাইয়টিক দিয়ে লাইনে আনা যাবে না। বিষয়টা একদিনের না।

এমন অনেক মা-বাবা আছেন যারা তাদের সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তুলেননি কিন্তু সন্তান বড় হবার পর তাকে সঠিক বানাতে চান, ইসলামের পথে আনতে চান। সন্তানকে ইসলামের পথে আনতে চেয়ে সন্তানকে জোর করে হজ্জে পর্যন্ত পাঠান এই আশায় যে, হাজ্জ থেকে ফিরে এসে সন্তান ভালো সন্তান হয়ে যাবে। অথচ হাজ্জে যাবার সময় ঐ সন্তান ওযুর ফরয কয়টি তাও জানে না, ফরয গোসলের নিয়মও জানে না, সলাতে শুধু উঠা বসাই করতে জানে। যে সকল মা-বাবাদের সন্তানরা এখনো শিশু, তারা অবহেলা করে নিজ জীবন দিয়ে অভিজ্ঞতা নেবার সাহস যেন না করি। এখুনি সচেতন হই।

তাই আমরা আমাদের সন্তানদের যদি ভাল চাই তাহলে তাদের পাশাপাশি আমাদের নিজেদেরকেও ভাল হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তাদেরকে গাইড করার পাশাপাশি নিজেদেরকেও ইসলামিক গাইড অনুযায়ী চলতে হবে। তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি নিজেরাও নিয়মিত পড়াশোনা করে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কারণ আমরা নিজেরা যদি সঠিক পন্থায় না চলি, কুরআনের দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে জীবনযাপন না করি তাহলে শুধু সন্তানদের ভাল চাওয়ায় সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবে না।

তরবীয়ত

সন্তানের তরবীয়ত সত্যি অনেক কঠিন কাজ,আর বর্তমান যুগে দিন দিন তা আরও কঠিন আকার ধারণ করছে।তাই বলে কি আমরা হতাশ হবো?নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেব?মোটেই না......আমাদেরকে আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং পাশাপাশি আমাদের স্বরন রাখতে

হবে যে আমি যতই কিতাব পড়িনা কেন, যতই মেধার অধিকারী হই না কেন,যতই আমার সন্তানকে নিয়ে পরিকল্পনা করি না কেনো;কোনো কিছুই পূর্ণতা পাবে না যদি না আমার রব চান।তাই সর্বপ্রথম আমাদেরকে আমাদের রবের মুখাপেক্ষী হতে হবে তার কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে।তিনি চাইলেই আমাদেরকে শান্তশিষ্ট, নেককার,দ্বীনদার, মুত্তাকী,পরহেজগার সন্তানের বাবা মা করতে পারেন।হ্যা তবে একথা সত্য যে সেজন্য আমাকে পরিশ্রম তো একটু করতেই হবে।বিনা পরিশ্রমে পারিশ্রমিক আশা করাটা বোকামি ছাড়া আর কিইবা হতে পারে?
আল্লাহ কোরআনে বলেছেন

"আর মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়। আর নিশ্চয়ই তার প্রচেষ্টার ফল সে অচিরেই দেখতে পাবে।"
(সূরা আন-নাজম: ৩৯-৪০)

"যারা আমাদের পথে প্রচেষ্টা চালায়, অবশ্যই আমি তাদের আমার পথে পরিচালিত করবো।"
সূরা আল-আনকাবুত: ৬৯

“নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।"
সূরা আর-রা’দ: **১১**

রাসূল ﷺ বলেছেন:
"তুমি উটকে বেঁধে রেখে আল্লাহর ওপর ভরসা করো।"
তিরমিজি: **২৫১**

উপরের আয়াত ও হাদিস আমাদের শেখায় যে, চেষ্টা করা আমাদের দায়িত্ব, আর ফলাফলের নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহর হাতে। তাই সর্বোচ্চ চেষ্টা করার পর আল্লাহর ওপর ভরসা করা উচিত।

তরবীয়ত কখন শুরু হবে?

দুটি বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে আমরা এটা অনুধাবন করতে পারি যে আমরা কখন থেকে সন্তানের তারবীয়ত শুরু করব অথবা কখন থেকে আমাদের শুরু করা উচিত।

ঘটনা ১: একবার এক শায়েখের কাছে একজন পিতা প্রশ্ন করেন শায়েখ আমার সন্তানের বয়স ৩ বছর। আমি কিভাবে তাকে তরবীয়ত দিতে পারি?শায়েখ তার জবাবে বলেছিলেন যে এখন তো অনেক দেরি হয়ে গেছে,

ঘটনা ২: পাকিস্তানের মাওলানা তারিক জামিল একবার আমারিকায় সফরে যান, সেখানে তিনি একজন মুফতি সাহেবের বাসায় মেহমান হিসেবে গেলে ৩ বছরের একটি বাচ্চা তাকে পরিপূর্ণ সালামের সাথে সুন্দর করে এস্তেগবাল করে,তিনি অবাক হয়ে মুফতি সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন এতো ছোট বাচ্চা কীভাবে এতো সুন্দর এস্তেগবাল করে?আপনারা এখানে কীভাবে বাচ্চাদের তরবীয়ত দেন?মুফতি সাহেব তাকে উল্টো প্রশ্ন করে কেন আপনারা পাকিস্তানে কীভাবে কি করেন নতুন বাচ্চা হলে?মাওলানা তারিক জামিল উত্তর দেন এই তো ৪০ দিন হবার পর তাকে সুন্নতি লেবাস পরাই,সুন্নত অনুযায়ী সব কাজ করি। তখন মুফতি সাহেব বলেন যে ৪০ দিনেই তো বাচ্চা কে শেষ করে দেন।

তাহলে আমরা যারা বলি বাচ্চা বড় হতে হতে সব শিখে নিবে তারা কতটা ভুলের মধ্যে আছি?

সন্তান তরবীয়তের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

-দ্বীনি আলোচনা:

কোলের বাচ্চা তার সাথে আবার দ্বীনি বিষয় কিভাবে আলোচনা করব?কোলের বাচ্চা কী দ্বীন বোঝে? যদি এমন প্রশ্ন আমাদের মনে আসে, তাহলে তার উত্তর হবে অবশ্যই কোলের বাচ্চা দ্বীন বোঝে, ছোট্ট শিশু যখন জন্ম নেয় তখন সে থাকে পবিত্র তার অন্তর থাকে পবিত্র কোমল, তখন তাকে যা শিক্ষা দেয়া হবে সে তাই শিখবে, যদিও তার প্রতিফলন দেখা যাবে বাচ্চা বড় হলে। কিন্তু আমাদের কাজ আমাদের শুরু থেকেই করা প্রয়োজন।

وَ اِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

আর স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, 'প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয় শিরক হল বড় যুলম।
সূরা লুকমান ১৩

يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ। সূরা লুকমান ১৭

এই আয়াতগুলোর দিকে মনোযোগ দিলেই বোঝা যায় যে কোলের বাচ্চার সাথেই দ্বীনি বিষয় আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন।

-অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং ভালোবাসা সৃষ্টি:

সন্তানকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করিয়ে দিতে হবে। তার যে একজন রব আছে সেটা তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তার রবের কাছে সব আছে, রবের কাছ থেকে সবকিছু চেয়ে নিতে হয়।

সর্বদা আল্লাহর ভয় দেখানো উচিত না,অন্যায় কাজ করলে,গুনাহের কাজ করলে আল্লাহ অবশ্যই নারাজ হবেন, শাস্তি দিবেন যার বর্ননা আমরা কোরআনে, হাদিসে পাই সেই বিষয়ে সন্তানকে অবশ্যই সতর্ক করতে হবে। কিন্তু সবসময় যদি আমরা তার সামনে এটা তুলে ধরি যে আল্লাহ শুধু শাস্তিই দেন তাহলে সে তার রবকে ভালোবাসবে কিভাবে? তাই আল্লাহর ভয় শেখানোর পাশাপাশি তাকে শেখাতে হবে যে তোমর রব তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসেন, তোমাকে তোমার রব নিজ হতে বানিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন,তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য । তোমাকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য খেদমত করতে হবে। আল্লাহ কিন্তু তোমার সব অবস্থায়ই জানেন আর সব সময়ই তোমাকে দেখছেন।

আল্লাহ কোরআনে বলেছেন বলেছেন,

اَلَمۡ یَعۡلَمۡ بِاَنَّ اللّٰهَ یَرٰیؕ

সে কি জানে না যে আল্লাহ তাকে দেখছেন!
সুরা আলাক: ১৪

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا وَ قُودُهَا ٱلنَّاسُ وَ ٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।

সূরা তাহরীম ০৬

আমারা যদি সন্তানকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করিয়ে দিতে পারি তাহলে সন্তান আমার আপনার অনুপস্থিতিতেও ভালো কাজে সময় পার করবে এবং গুনাহের কাজ থেকে দূরে থাকবে।

-রাসুলের ভালোবাসা :

সন্তানের অন্তরে ছোট থেকেই রাসুল (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসার বীজ বুনে দেয়া।সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের সাথে তাকে পুংখানু পুংখানু ভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। রাসুল (স:)যে তাকে কত ভালোবাসে সেটা তাকে বলা, সীরাত পড়ে তাকে শোনানো। সন্তান কে সুন্নত অনুযায়ী সব কাজ করানো এতে করে তার জন্য বড় হলে সুন্নতের পাবন্দি করা মোটেই কঠিন কাজ হবে না এবং তার অন্তরে উম্মতের যে একটা ব্যথা সেটাও তৈরী হবে ইনশাআল্লাহ।

-সালাম এ অভ্যস্ত করা:

সালাম অর্থ শান্তি, যখন আমার ঘরে সালামের প্রচার প্রসার ঘটবে তখন অটোমেটিক একটি দ্বীনি মহল বিরাজ করবে আমার ঘরে।সন্তানের সাথে সবসময় সালাম দিয়ে কথা বলা।ঘরের বাকিরাও নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যপক প্রচলন করা।বাচ্চারা বলার দ্বারা কম দেখার দ্বারা বেশি শেখে।

-**মক্তবে পাঠানো:**

বাচ্চার বয়স যখন প্রায় পাঁচ বছর হবে তখন বাচ্চা কে মক্তবে পাঠাতে হবে এবং আরও আগে থেকেই তার অন্তরে এই মোহাব্বত তৈরি করে দিতে হবে যে মক্তব দ্বীন শিখার স্থান, সেখানে আমার যেতে হবে এতে করে বাচ্চা কে মক্তবে পাঠাতে বাবা মায়ের জোর করতে হবে না, বকাঝকা দিতে হবে না, বাচ্চা নিজেই যাবে এবং আনন্দের সাথে যাবে।

শৈশবেই যদি শিশুকে আল্লাহর কালাম ও ধর্মোউপদেশ শিক্ষা না দেয়া যায় তাহলে শেষে সন্তানের চরিত্র গঠন করা যায় না।

“মাটি নরম থাকতেই সাঁচে না বসালে যত দক্ষ কুমোর ই হোক না কেন সুন্দর বাসন পত্র তৈরী হবে না”।

তাই মা বাবা যত বড় দ্বীনদার ই হোক না কেন ছোট থেকে দ্বীন শিক্ষা না দিলে, সন্তান দ্বীনদার হবে না।কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে সেটা আলাদা বিষয়। আল্লাহর কালাম নবীর সুন্নত ছাড়া সন্তান আর যাই হোক, দ্বীনদার হবে না, আদর্শ মানুষ হবে না।

সন্তান প্রথম মক্তবে যাচ্ছে সেই খুশিতে সাধারণত লোকেরা কিছু মিষ্টি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে থাকে। আবার শিশু যখন কুরআন শরীফ শুরু করে তখনও উস্তাদকে কিছু হাদিয়া দেয় বা মিষ্টি খাওয়ায়, এমন কাজ করা দোষের কিছু নয়। বরং এর দ্বারা কুরআনের তা'জীম করা হয় এবং এতে সন্তানের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। এই বিষয় নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি করা শোভনীয় নয়।অবশ্য অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার।

-সালাত শিক্ষা:

মুসলমান ও কাফেরের মাঝে পার্থক্যকারী হলো নামাজ।নামাজ জান্নাতের চাবি।নামাজ মুমিনের মেরাজ,বান্দা যখন নামাজে দাড়ায় আল্লাহ তখন পূর্ণ মনোযোগ সহকারে তার বান্দাকে দেখে।
আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন,
আল্লাহ কোরআনে বলেছেন
ِأَقِمِ الصَّلاةَ، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
অর্থাৎ- নামায প্রতিষ্ঠা কর। নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও কুকর্ম হতে বিরত রাখে।
সূরা আনকাবুত ৪৫ আয়াত
আল্লাহ আরও বলেছেন
َقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْن
অর্থঃ- নিশ্চয় সাফল্য লাভ করেছে ঐ সব মু'মিনরা; যারা নিজেদের নামাযে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে।
সুরা মু'মিনুন ১-২ আয়াত

একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি তোমাদের কারো ঘরের পাশ দিয়ে কোন নদী প্রবাহিত হয় আর তার মধ্যে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহলে বল, তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি?” সাহবাগণ প্রত্যুত্তরে বললেন, না, তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা বাকি থাকতে পারে না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, "এরূপ উদাহরণ হচ্ছে পাঁচ অয়াক্ত নামাযের।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর হাদীস অনুযায়ী সন্তানদের ছোট অবস্থায় নামাযের শিক্ষা দেওয়া অতি প্রয়োজন। যাতে তারা বড় হলে নামাযকে অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের শিক্ষা প্রদান কর যখন তাদের বয়স সাত বছর হবে। আর দশ বছর বয়স হলে (নামায না পড়ার কারণে) তাদেরকে প্রহার এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।"
সহীহ, আহমদ

আর তাদের সামনে ওযু করে ও নামায পড়ে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া যায়। তাদেরকে সঙ্গে করে মসজিদে নিয়ে যাওয়া এবং এমন বই পড়তে উৎসাহিত করা যাতে নামাযের পদ্ধতি পরিবেশিত হয়েছে।

সন্তানদেরকে জুমআর দিন ও প্রত্যেক ওয়াক্ত মসজিদে নিয়ে গিয়ে লোকদের পিছনে কাতারে জামাআতের সহিত নামায আদায় করার উৎসাহ দেওয়া। আর যদি তারা কিছু ভুলভ্রান্তি করে ফেলে তাহলে তাদেরকে নম্রভাবে বোঝানো।
অতএব তাদেরকে ধমক দিয়ে বা জোর গলায় কিছু না বলা। কারণ, হতে পারে তারা এতে নামায ত্যাগ করে দিতে পারে। যার ফলে আমরা গুনাহগার হয়ে যাব।যদিও হাদিসে সাত বছর বয়সে নামাজ এর তাগীদ দিতে বলা হয়েছে কিন্তু আমরা যদি একদম ছোটবেলা থেকেই নিজের পাশে জায়নামাজ বিছিয়ে তাকে শুয়িয়ে রাখি এবং নিজেরা তার পাশে নামাজ আদায় করি এটার একটা সুন্দর প্রভাব বাচ্চাদের উপর পরবে ইনশাআল্লাহ।

কোরআন তিলাওয়াতে অভ্যস্ত করা:

কুরআনে কারীম হলো মহামহিমান্বিত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলার বাণী। যার মধ্যে নিহিত আছে সমগ্র মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কল্যান ও সৌভাগ্য। অতীতে ও বর্তমানে মানবজাতির মর্যাদা ও গৌরব আল্লাহর কালাম ও রাসূলুল্লাহ(সা:)-এর সুন্নাহর আনুগত্য ব্যতীত কখনোই উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সুতরাং কুরআনে কারীম নিজেরা মুখস্থ করা এবং সন্তানদের তা মুখস্থ করানো আমাদের কর্তব্য। আধুনিক পাঠ্যক্রম প্রমাণ করেছে যে, এ বয়সে শিশুদের এ সামর্থ্যকে কুরআনে কারীম হেফজ করা ও অধিকাংশ মুসলিম দেশসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাহফিজুল কুরআনের আসরে তাদের অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে উত্তমরূপে কাজে লাগাতে হবে। শিশু যেটা হিফজ করতে চায় তা কয়েকবারের বেশি তাকে পুনরাবৃত্তি করতে হয় না। এমনি করে সে আল্লাহর ইচ্ছেয় হাফেজে কুরআন হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদও রয়েছে,,,

"শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে খোদাই করা"

অতীতে ও বর্তমানে এমন অসংখ্য হাফেজ রয়েছে যারা শৈশবকালেই কুরআন হেফজ করতে সক্ষম হয়েছেন। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তাফসীর সংক্রান্ত বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো। কারণ আমি কুরআন কারীম হেফজ করেছি যখন আমি ছোট ছিলাম।' ইমাম বুখারী তার গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি অধ্যায় রেখেছেন। তার শিরোনাম করেছেন: 'শিশুদের কুরআনে কারীম শিক্ষা দান।'
কুরআনে কারীম হেফজের দ্বারা শিশুর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এমনকি সে নামাযে জামায়াতে অগ্রগামী হয় ও অনেক বড় বড় শায়খদেরও ইমামতি করে যদি তার হিফজের পরিপক্কতা তাদের চেয়ে বেশি হয়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা:)মুসলমানদের বলেছেন,

"তোমাদের ইমামতি করবে যে তোমাদের মধ্যে বেশি কুরআন সম্পর্কে জানে।"
ওমর বিন সালিমাহ (রা:) তার সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন, 'তারা লক্ষ্য করে দেখলেন আমার থেকে বেশি কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ কেউ নেই। কারণ আমি অশ্বারোহী মুসলিম যোদ্ধাদের কাছে কুরআন শিখেছিলাম। অতএব ইমামতির জন্য তারা আমাকেই সামনে পাঠাল। অথচ আমি তখন ছয় অথবা সাত বছরের মাত্র।

আদব শিক্ষা :

আদব আজ বর্তমান সমাজ থেকে বিলুপ্ত প্রায় এক শব্দ। আদব শব্দ টা যেন বড্ড পুরনো এবং ব্যকডেটেড।সেজন্যই আজ সমাজের এমন নাজেহাল অবস্থা। কথায় আছে বেয়াদব কে আল্লাহ হেদায়েত দান করেন না।যে ব্যক্তি আদব এর এহতেমাম করে তার জন্য সুন্নতের উপর আমল করা সহজ,আর যার জন্য সুন্নতের উপর আমল করা সহজ তার জন্য ফরযের উপর আমল করা সহজ হয়।তাই আমরা আমাদের সন্তানদের আদব শিক্ষা দেয়ার ব্যপারে সচেতন হব।নিচে কিছু পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হলোঃ

১- আমাদের উচিত শিশুকে ডান হাত দ্বারা খাওয়া-দাওয়া ও লেনদেনে অভ্যস্ত করানো এবং বসা অবস্থায় যেন খাওয়া-দাওয়া করে আর খাবার শেষে শুকরিয়া আদায় করতে শেখানো।

২- শিশুকে পরিষ্কার-পরিছন্নতায় অভ্যাস করানো। এইভাবে যে, সে যেন নখ কাটে, খাওয়ার পূর্বে ও শেষে হাত ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়। আর তাকে প্রস্রাব পায়খানার নিয়ম পদ্ধতি উত্তমভাবে শিখানো; যাতে সে উত্তমভাবে পবিত্রতা হাসিল করতে পারে।

৩- আমাদের উচিত তাদেরকে নিরিবিলি পরিবেশে নম্রভাবে নসীহত করা, এইভাবে যে, যদি তারা কোন ত্রুটি করে ফেলে তবুও তাদেরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবো না। তারপরও যদি তারা অবাধ্যতায় অবিচল থাকে তাহলে তাদের সঙ্গে তিন দিন কথাবার্তা বন্ধ করে দিব। তবে তিন দিনের বেশি নয়।

৪- আযানের সময় সন্তানদেরকে নীরব থাকার উপদেশ করা এবং আযানের উত্তর দিতে শেখানো, আযান শেষে দোয়া পাঠ করতে শেখানো।

৫- শিশুদেরকে অভ্যস্ত করানো যেন তারা পথে ঘাটে কোন প্রকার কষ্টদায়ক বস্তু ও ময়লা-আবর্জনা না ফেলে। বরং এধরনের বস্তু পথে-ঘাটে দেখতে পেলে তা যেন উঠিয়ে ফেলে দেয়।

৬- চরিত্রহীন সঙ্গী-সাথী হতে তাদেরকে সতর্ক রাখা এবং তারা। রাস্তা-ঘাটে যাতে না দাঁড়ায় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

৭- শিশুদেরকে ঘরে, রাস্তা-ঘাটে এবং ক্লাসে সালাম প্রদান করা শিখানো।

৮- সন্তানদেরকে পাড়া প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার আর তাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়ার উপদেশ দেওয়া।

৯- সন্তাদেরকে অতিথির আদর ও সম্মান করার অভ্যাস করানো। আর তার জন্য উত্তম খাবার এর ব্যবস্তা করতে বলা।

জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা:

জিহাদ ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ বিধান পাশাপাশি বর্তমানে অবহেলিত।ইসলাম যেন আজ শুধু নামাজ,রোজা,দাড়ি,টুপির মধ্যেয় সীমাবদ্ধ। জিহাদ নিয়ে কেউ কথাই বলে না,কিছু বললেই জঙ্গি, সন্ত্রাস ইত্যাদি ট্যগ বসিয়ে দেয়া হয়।জিহাদের আলোচনা এলেই সবাই মুখ লুকিয়ে বেরায়। কিন্তু এই জিহাদ এর মাধ্যমে ইসলাম কে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, পরাজিত হয়েছিল হাজারো বাতিল শক্তি।ইসলামের ইতিহাসে মুসলিমরা ছিলো বীরের জাতি আর আজ মুসলিমরা আজ নির্যাতিত,অবহেলিত কাপুরুষের জাতিতে পরিণত হয়েছে জিহাদ পরিত্যগ করার কারনে।সত্য

কে সত্য আর বাতিল কে বাতিল বলার সৎ সাহস না থাকার করনে।তাই নির্যাতিত উম্মাহ কে হেফাজত করতে আমাদের সন্তানের জিহাদী তামান্নাসহ গড়ে তো অতি জরুরি এবং ধর্মীয় দায়িত্ব। সেজন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো আমরা গ্রহণ করতে পারি;

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাদের জীবনী সম্পর্কীত বই পড়ে শোনানো এবং বাচ্চাদেরকে পড়তে বলা । এতে করে তারা জানবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহসী এবং বীর নেতা ছিলেন। সাহাবাগণ নানান দেশ বিজয় করেছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছি। আর তাঁরা কেবলমাত্র নিজেদের দৃঢ় ঈমান, জিহাদী মনোবল, কুরআন-হাদীসের নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করে এবং তাঁদের মহান চরিত্রের ফলে বহু দেশে বিজয়ী হয়েছেন।

২- সন্তানদেরকে বীরত্ব, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করার উপর প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালন করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় না করার শিক্ষা দেওয়া। আর তাদেরকে মিথ্যা কাহিনী বলে অথবা কোন কাল্পনিক ও অবান্তর কথা বলে ভয় প্রদর্শন করা বৈধ নয়।

৩- আমরা যেন সন্তানদের অন্তরে ইহুদী ও অত্যাচারীদের অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা জাগাই। আর আমাদের যুবকরা যখন ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন তারা অতিশীঘ্রই প্যালেস্টাইন এবং জেরুযালেমের বাইতুল মোকাদ্দাস স্বাধীন করবে ইনশাআল্লাহ । আল্লাহর হুকুমে তারা বিজয় লাভ করবে।

সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিন:

সব অভিভাবকই জীবিকা অর্জনের পেছনে অনেক ব্যস্ত সময় পার করেন। অনেকে আবার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকেন। ফলে অনেক বাবাই বাস্তবতার কারণে সন্তানদের যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। সারাদিন উপার্জনের পেছনে ব্যস্ত সময় কাটানোর পর তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সন্তানদের খাওয়া-দাওয়া, স্কুলের জন্য তাকে প্রস্তুত করা,

তার জামা-কাপড় পরিষ্কার করাসহ যাবতীয় বিষয়াদি মায়ের একাই দেখতে হয়। সন্তানকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং অতিরিক্ত কাজ অনেক সময় তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে একসময় মনের অজান্তেই মা সন্তানকে বকা দিয়ে বসেন। মায়ের বকা খেয়ে শিশু নিজেকে একটি আবদ্ধ রুমের মধ্যে আটকে রেখে টিভি দেখে অথবা কম্পিউটারে গেমস খেলে।

আর যখন পিতা-মাতা উভয়ই চাকরি করে, তখন এর পরিণতি হয় আরও ভয়াবহ। এতে শৈশব শেষে দেখা যায়, শিশু তার জীবনের অধিকাংশ সময় ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমেই কাটিয়েছে, যার কোনো পজেটিভ ফলাফল নেই। পিতা-মাতার মধ্যে বিভেদ থাকলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা। এতে সন্তানের সাথে তাদের বন্ধন হয় দুর্বল এবং সন্তান পরবর্তী জীবনে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।
সুতরাং সন্তানদের সাথে সময় কাটানো আয়েশ হিসেবে নয়; বরং অতি জরুরি হিসেবে দেখতে হবে। পিতা-মাতার উচিত দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। শুধু ব্যয়বহুল কোনো প্রাইভেট স্কুল শিশুর জন্য শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ কিনে আনতে পারে না। ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালো সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি অর্জন জীবনের সফলতা নয়। কী হবে এ জীবন দিয়ে, যদি শুধু ধন-সম্পদ অর্জনের পেছনেই জীবনের মূল্যবান সময়গুলো ব্যয় করি এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু তৈরি করতে না পারি?

সন্তানদের সাথে একটা উল্লেখযোগ্য সময় কাটাতে হবে, যা কখনো কখনো একান্ত ব্যক্তিগত হবে। এই সময়টুকু হবে মায়া-মমতায় ভরা ও অর্থবহ। তাদের সাথে একসঙ্গে বসে কিছু দেখা, খোশগল্প করা, বাইরে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া, পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মজা করা, তাদের হোমওয়ার্ক তৈরিতে সাহায্য করা ইত্যাদি। ছোটোখাটো পদক্ষেপগুলো শিশুদের সাথে অভিবাবকদের বন্ধন সুদৃঢ় করে, বিশ্বাস ও ভালোবাসা বাড়ায়, আত্মীক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়।

আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা:) শিশুদের সঙ্গে শিশুর মতো আচরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর চাচা আব্বাস (রা:)এর তিন সন্তানকে নিয়ে একসঙ্গে খেলতেন এবং তাঁর দিকে দৌড়ানোর জন্য বলতেন। তাঁরা তাঁর ওপর লাফাত এবং দৌড়াত, আর নবিজি (সা:) তাঁদের বুকে নিয়ে চুমু খেতেন। যখন তাঁর দুই নাতি হাসান ও হুসাইন (রা:)তাঁর পিঠের ওপর উঠে খেলত, তখন মাঝে মাঝে তিনি তাঁর হাত ও হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিতেন।

সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্তা করুন

কারও শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে বিনোদন অপরিহার্য। মানবজাতি যন্ত্রের মতো কাজ করতে পারে না। যথাযথ উপায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের শরীর ও মনের বিশ্রামের প্রয়োজন। অর্থহীন বিনোদন মন ও আত্মার কোনো কাজেই আসে না; মাদকদ্রব্যের ব্যবহার শরীরকে ধ্বংস করে দেয়। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা আধ্যাত্মিক অনুভূতি বিনষ্ট করে দেয়।

মুহাম্মাদ (সা:) তরুণদের ঘোড়দৌড়, তির-ধনুকের ব্যবহার ও সাঁতার কাটার মতো শারীরিক ব্যায়ামের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি শেখানোর ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন।

রুচিশীল খেলাধুলা ও ব্যায়াম শারীরিক সুস্থতা, আনন্দ ও শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম উৎস-যা একজন ব্যক্তির কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। এই সকল ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সন্তানদের উৎসাহ দেওয়া উচিত, যাতে তারা এই সকল বিষয়ে অভ্যস্ত হতে পারে। অতিরিক্ত আদেশ-নিষেধ সন্তানদের মনে বঞ্চনার মনোভাব সৃষ্টি করে, যার ফলে তারা পিতা-মাতা এমনকী ধর্মের প্রতিও বিরক্তি প্রকাশ করে।

প্রকৃত সফলতার শিক্ষা দিন:

প্রত্যেক পিতা-মাতাই সন্তানদের সফলতা কামনা করে। স্বপ্ন দেখেন; যদিও সফলতার সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে। সফলতার সাথে আত্মবিশ্বাসের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সফলতার অর্থ হলো-ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে দুনিয়া ও পরকালীন জীবনের কল্যাণ অর্জন করা এবং একটির কারণে অপরটির ক্ষতিসাধন না করা। অর্থাৎ একই সঙ্গে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ অর্জনই চূড়ান্ত সফলতা।

আল্লাহর রাসূল (সা:) সহ অন্য সকল প্রেরিত নবি-রাসূল মানবতার মহান শিক্ষক ছিলেন। পবিত্র কুরআনে শোয়াইব-(আ:)এর কথা এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে-

'আমার সফলতা একমাত্র আল্লাহর দয়ার ওপরই নির্ভরশীল।'

সূরা হুদ: ৮৮

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এটি বিশ্বাস করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, সফলতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। সচেতন অভিভাবকগণ উত্তম শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সন্তানদের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। পিতা-মাতাকে অবশ্যই সন্তানদের জন্য মানসম্মত স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, নিজের ঘরই সবচেয়ে বড়ো আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-যেখানে জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই শিশুদের প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয়। খলিফা উমর-(রা:)এর মতে, এর সময়কাল হচ্ছে বাচ্চার জন্ম থেকে সাত বছর। এটি এমন একটি সময়, যখন পিতা-মাতার কর্তব্য হলো নিজের বেশিরভাগ সময় ও শক্তি সন্তানের পেছনে বিনিয়োগ করা, তাদের সাথে খেলাধুলা করা এবং খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া।

আত্মসংশোধনের শিক্ষা দিন

শরিয়তের পরিভাষায় আত্মা সম্পর্কে বেশ আলোকপাত করা হয়েছে।আল্লাহ তা'য়ালা আত্মা সম্পর্কে বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا.

নিশ্চয় সে সফলকাম হয়েছে যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে। একা সে ব্যর্থ হয়েছে যে একে কলুষিত করেছে।"*

তিনি আরো বলেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النفس عن الهوى فَإِنَّ الجلد

المادي.

"আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে এজেকে বিরত রাখে নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাস স্থল"।

এ আয়াতগুলো আত্মার প্রতি যত্ন নেয়ার গুরুত্বকে স্পষ্ট করে দেয়। ফলে আত্মা থেকে দোষ-ত্রুটিকে 'না' বলে দেয়া হয়। কথা ও কাজের মাধ্যমে আত্মাকে নির্মল ও পরিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালায়। অভিভাবকের জন্য শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করা ঠিক নয়। এরপর সে শিশুর আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও সমূহ ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে নিষ্কলুষ করবে। বরং তার সঙ্গে ভালো-মন্দ নির্ণায়ক বয়স আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয় তার সঙ্গে সূচনা করবে। তার সামনে স্পষ্ট করে তুলবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সকল ব্যাপারে অবগত, তার কোনো কিছুই তার কাছে লুকায়িত নেই। কেরামান কাতেবীন ফেরেশতা তার ভালো-মন্দ সকল কর্ম লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। সুতরাং তাকে কল্যাণকর কাজের নির্দেশ করবে এবং অন্যায় ত্যাগ ও নিজের আত্মার পর্যবেক্ষণের দিকে আহ্বান জানাবে। তার সামনে ফুটিয়ে তুলবে রাসূলুল্লাহ (সা:) কিভাবে তার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি একদিন রাসূলুল্লাহ- (সা:)এর পেছনে ছিলাম। তিনি বললেন- 'হে বৎস, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি শোন। তুমি আল্লাহর হুকুমকে রক্ষা করলে আল্লাহ তা'আলাও তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর হুকুমকে রক্ষা করলে আল্লাহকে তোমার নিকটেই পাবে...।' এখানে রাসূলুল্লাহ (সা:) তার এই ধ্যান মগ্নতার ওপর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাকে ইহকালে সকল বিপদ থেকে রক্ষা

করবেন। পরকালে জাহান্নাম ও তার শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। কারণ, সে আল্লাহর হুকুমসমূহ সংরক্ষণ করলো ও তার সমৃদ্ধি অর্জনে ধন্য হলো। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার সন্ধ হবেন ও তাকে কখনও ছেড়ে যাবেন না। অতএব ভারসাম্য রক্ষা করে আত্মশুদ্ধি ও আত্মাকে নির্মল করার দ্রুত প্রশিক্ষণ প্রদান শিশুকে তার প্রতিপালকের ধ্যানমগ্ন হতে ও আত্মসমালোচনা করতে অভ্যস্ত করবে। ফলত এর একটা ভালো প্রভাব তার পরবর্তী জীবনে পড়বে।

কল্যাণকর কাজে অভ্যস্ত করুন:

মানুষ অভ্যাসের দাস। সাধারণতঃ মানুষ কোনো কাজে অত্যন্ত হয়ে যাওয়ার পর সেটা করতে তার কষ্ট হয় না। বাস্তবে তা যতই কষ্টসাধ্য কাজ হোক না কেন। সে কারণে কাঙ্খিত আচরণরকে অভ্যাসে রূপান্তরিত করা সন্তান প্রতিপালনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

কাঙ্খিত আচরণকে অভ্যাসে রূপান্তরিত করতে হলে একজন অভিভাবকের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বারবার তা পুনরাবৃত্তি এক অর্থে কঠিনভাবে এর অনুশীলন করতে হবে। অতঃপর কালক্রমে তা শিশুর অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। ফলে অভিভাবক থেকে ঐ কাজের কোনরূপ অনুরোধ ব্যতিরেকে উক্ত কাজের দাবি এলেই সে তা সম্পন্ন করে ফেলবে। যেমন: কোনো মুসলমান যদি হাঁচি দেয়ার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে অভ্যস্ত থাকে, যদি সে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত থাকে বা খুব ব্যস্ত থাকে, তাহলেও সে হাঁচির পরই বলে উঠবে 'আলহামদুলিল্লাহ।' কারণ, এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। এমনটিই হয়ে থাকে। সে কারণে হাদিসে এসেছে-

الْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ مَنْ يُرِدَا اللَّهِ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

"কল্যাণ ও মঙ্গল হলো অভ্যাস, অমঙ্গল ও অকল্যাণ হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদ। আল্লাহ তা'য়ালা যার মঙ্গল চান তাকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান দান করেন।"

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)বলেন, 'নামাযের ব্যাপারে তোমাদের সন্তানদের প্রতি যত্নবান হও। তাদের কল্যাণ শিক্ষা দাও! অনন্তর কল্যাণই হচ্ছে অভ্যাস।'
মুয়াবিয়া (রাঃ)বলেন,
'তোমরা নিজেদের কল্যাণের ওপর অভ্যস্ত করে নাও।'

সুতরাং বাচ্চাদের কল্যাণের ওপর অনুপ্রাণিত করাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অভিপ্রায় । এক ভদ্র মহিলা রাসূলুল্লাহ-(সা:) এর নিকট একটি বাচ্চা উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল-'এর জন্যে কি হজ্জ আছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, 'হ্যাঁ আছে, তবে এর বিনিময় পাবে তুমি।' বাচ্চাটি ছোট, হজ্জের আহকাম সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে ওই মহান ব্রতে অভ্যস্ত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর 'এ দায়িত্ব পালন করলে তার জন্য পুরস্কার রয়েছে' বলে তার মাকেও উৎসাহিত করেছেন। যখন মুসলিম মহিলাগণ নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যেতেন অথচ অনেক বাচ্চা কান্নাকাটি করতো।

এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ(সঃ) তাদের মসজিদে নিয়ে আসতে নিষেধ করেননি। বরং শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, এমনকি তাদের জন্য নামায সংক্ষিপ্ত করতেন। আমাদের দৃষ্টিতে এটা রাসূলুল্লাহ (সা:)মসজিদে আসতে অভ্যস্ত করার জন্যই করতেন।

সন্তান রাগ করলে করনীয়:

সন্তান তখনই রাগান্বিত হয়, যখন সে কিছু করতে চায়, অথচ তার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। তারপরও সে নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী করতে চায়, কিন্তু পারে না। অবশেষে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, রাগান্বিত হয়, যখন কারো মধ্যে রাগ সৃষ্টি হয়, তখন সে মস্তিষ্ককে কাজে লাগাতে অক্ষম হয়ে পড়ে। ফলে রাগ নিজের মতো কাজ করতে থাকে। তাই বাচ্চা যাতে রাগান্বিত হয়, এমন পরিস্থিতির যেন সৃষ্টি না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা:) পরিষ্কারভাবে নিষেধ করেছেন যে, 'রাগ করো না। যদি চিন্তা করেন, তবে এর কারণ সহজে বুঝে আসবে। রাগান্বিত অবস্থায় মানুষ কত কী না করে। অথচ কোনো কোনো পরিবারে বাচ্চাকে সময়ে-অসময়ে উত্তেজিত করা যেন সে কাঁদে অথবা রাগ করে, এটি একটি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। একেও এক ধরনের আদর মনে করা হয়। আল্লাহই ভাল জানেন এটি কোন ধরনের আদর?

শরীরের জন্য রাগ অত্যন্ত ক্ষতিকর। কেউ যখন রাগ করে, তখন তার শরীরে এক ধরনের অতিরিক্ত শক্তি উৎপন্ন হয়। যখন এ শক্তিটি বারবার সৃষ্টি হতে থাকে তখন অনর্থক শক্তি ক্ষয়ের কারণে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বাচ্চা বদমেজাজী হয়ে যায়। এজন্য বাচ্চাকে অসন্তুষ্ট করার পরিবর্তে তাকে সান্ত্বনা দেয়া চাই, তাকে বিভিন্ন রকমের খেলাতে মগ্ন রাখা চাই, যাতে তার মস্তিষ্ক রাগের দিকে না ঝোঁকে।

বাচ্চারা শুধু এজন্য রাগ করে না যে, তাদের কাজের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় বরং অনেক সময় এমনও হয় যে, ঘরে বদ মেজাজী লোক বেশি থাকার কারণে বাচ্চারাও তাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে।

একটি পরিবার সম্পর্কে কথাটি বললে হয়তো আপনাদের ভাল বুঝে আসবে। এক সম্মানিত ব্যক্তি দ্রুত রাগান্বিত হওয়াকে মনে করত তার মাতব্বরী এবং নেতৃত্বের শান। যে কোনো কথায় বিগড়ে যাওয়াকে সে একটি গুণ মনে করত। একদিনের ঘটনা: ঘরে তরকারী কম ছিল। এরজন্য কিছু বলার পরিবর্তে প্লেট উঠিয়ে বারান্দায় নিক্ষেপ করে চাপাতিগুলো কুকুরের সামনে ছুড়ে মারে। পরিবারের সব লোক তার এ আচরণে ভীত হয়ে পড়ে। এর তিন-চারদিন পর তাদের একমাত্র ছেলে খানা খেতে বসেছিল। সেদিন সম্ভবতঃ খানা খারাপ অথবা ভাতের প্লেট আসতে দেরি হয় এতে সে ভাতের প্লেট বারান্দায় ফেলে দেয় এবং রাগ করে চলে যায়।

মোটকথা, বাচ্চাদের মধ্যে বদমেজাজ সৃষ্টি হওয়ার একটি কারণ হলো পরিবারের অন্য লোকের বদমেজাজী হওয়া। তাই উচিত হলো, বাচ্চাদের সামনে রাগ না দেখানো, ঘরকে অশান্তিতে পরিণত না করা এবং তার সামনে একথা না বলা যে, ছেলেটি জন্মসূত্রে রাগ পেয়েছে, তার পিতাও এ ধরনের রাগ করে থাকে। কারণ, এ ধরনের কথায় সে মনে করতে পারে যে, তার কোনো গুণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। সুতরাং সে উক্ত গুণটি ভালভাবে চর্চা করার চেষ্টা করে।

সাধারণতঃ বাচ্চারা ঐ সময়ও রাগ করে, যখন সে কোনো প্রয়োজন প্রকাশ করে, কিন্তু অন্যরা বুঝতে পারে না। এ রকম অবস্থায় অত্যান্ত ধৈর্যের পরিচয় দেয়া চাই। বাচ্চা যদি তার কথা বুঝাতে অক্ষম হয়ে রাগ দেখায়, তবে এমতাবস্থায় না বুঝার কারণে আপনার রাগ করা উচিত নয়। বরং আপনার উচিত হলো ভ্রূকুচকানো থেকে বিরত থাকা, অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তার কথা বুঝার চেষ্টা করা ও তার প্রয়োজন মিটানো। দু'-চারবার যখন বাচ্চা আপনার এ আচরণ দেখবে, তখন সে নিজে নিজেই বিফল হয়ে কী করতে হবে, তা শিখে নিবে।

রুগ্ন অবস্থায় সাধারণত বাচ্চা খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায়। সে তখন বিভিন্ন চাহিদা প্রকাশ করে, কিন্তু সেগুলো পূর্ণ করা তার জন্য ক্ষতিকর। আর পূরণ না করলে সে সামান্য কথায় রেগে যায়। এর মূল কারণ হচ্ছে, সে সীমাতীত কষ্ট ভোগের কারণে মায়া-মমতা পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে পড়ে। তার সাথে অপারগ লোকদের ন্যায় আচরণ করাকে সে অপছন্দ করে। এজন্য এ সময় যদি তার সাথে অতিরিক্ত মনোযোগপূর্ণ ব্যবহার করা হয় এবং তার চাহিদাকে অন্য

জিনিসের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, তাহলে বাচ্চা এ অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। দুর্বল বাচ্চাদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা চাই। কেননা তারা নিজেদের দুর্বলতার ক্ষেত্রে রাগকে কাজে লাগায়। তারা যদি কোনো কাজে বিফল না হয়, তবে রাগ থেকে রক্ষা পাবে। কাজেই তাদেরকে এমন কাজে লাগানো চাই, যেগুলোতে তারা সফল হবে। তাদেরকে এমন পরিবেশে রাখা চাই, যেখানে অন্যরা তার দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে অসৎ স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করবে না। তাহলেই সন্তানের রাগ নিয়ন্ত্রণে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা :

যেসব সুন্দর সুন্দর চরিত্রে শিশুকে প্রতিপালিত করা উচিত তার অন্যতম একটি চরিত্র হলো ক্ষমা ও উদারতা। এর তাৎপর্য বর্ণনায় কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। একদিকে কুরআনে কারীমের বক্তব্য যেভাবে ধৈর্য ও ক্ষমার প্রশংসা করেছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ.

"যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোস নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে”।
সূরা- শুরা:৪০

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন-

وَلَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُوْرِ.

"অবশ্য যে ধৈর্যধারণ করে ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় তা দৃঢ় সংকল্পেরই”।
সূরা -শুরা:৪৩

তেমনিভাবে মন্দের সমপরিমাণ মন্দ দ্বারা প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। যেমন: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَجَزْؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا.

"মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ "।
সূরা-শুরা:৪০

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন-

وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل.ٍ

"অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন। ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না"।
সূরা-শুরা:৪১
শরিয়তের প্রমাণ তারই প্রশংসা করে, যে অত্যাচারীর প্রতিবিধান করে।
আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদারদের প্রশংসায় বলেন-
وَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْرُ هُمْ يَنْتَصِرُوْن. َ

'এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।
সূরা -শুরা:৩৯

অতএব, ক্ষমা ও উদারতার মতো চরিত্র মাধুর্য একান্তভাবে কাম্য। যেমনিভাবে প্রতিশোধ ও প্রতিবিধানের চরিত্রও কাম্য। এর যেকোন একটাকে উপেক্ষা করলে অথবা তার আশ্রয় না নিলে জীবন প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে না। যখন অধিকাংশ অভিভাবকের চিন্তা-চেতনা শিশুর মনে ক্ষমা ও উদারতার মর্মবাণী দৃঢ়মূল করতে বদ্ধপরিকর, তখন তাদের মধ্যে অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারীদের প্রতিশোধ ও প্রতিবিধান করার মর্মবাণীও তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হতে হবে। বিশেষ করে যখন বর্তমান বিশ্বের মুসলমানগণ তাদের আদিম শত্রু ইয়াহুদি-খৃস্টান কর্তৃক আগ্রাসী আক্রমণের শিকার। রাসূলুল্লাহ (সা:) মুসলমানদের মধ্যে এ চরিত্র নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকি তাঁর পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণের মধ্যেও। আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

'আমার অজ্ঞাতসারে যয়নব(রা:) অনুমতি ছারাই রাগান্বিত অবস্থায় আমার ঘরে প্রবেশ করেন। এরপর তিনি বললেন- হে আল্লাহর রাসূল (সা:) আবু বকরের কন্যা তার হাতের দু'টি কংকন দিয়ে দিয়েছে তাতেই কি আপনি সন্তুষ্ট? অতঃপর তিনি আমার দিকে ফিরলে আমি তার দিকে মুখ করে তাকাতেই দেখি তার মুখ শুকিয়ে গেছে, তখন আমি তার কথার উত্তর দিলাম; ফলে

আমার কোন প্রতিউত্তরই তিনি আর করতে পারলেন না। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতা লক্ষ্য করলাম।'

উপরে হাদিস দ্বারা এটাই প্রমানিত যে, যয়নব (রা:)যখন আয়েশা (রা:)-এর প্রতি অবিচার করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে প্রতিবিধান করার সুযোগ প্রদান করলেন। ক্ষমা ও উদারতার নির্দেশ করেননি। বরং তাঁর মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতা তখন পরিস্ফুটিত হয়েছে যখন তার অধিকার আদায় করে নিতে দেখলেন। আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

'রাসূলুল্লাহ (সা:) তাঁর এক স্ত্রীর কাছে ছিলেন, তখন আমাকে তাঁর আরেকজন স্ত্রী একটি পাত্রভর্তি খাবার নিয়ে পাঠালেন। তখন তিনি যে স্ত্রীর ঘরে ছিলেন তিনি আমার হাতে আঘাত করেন; ফলে পাত্রটি হাত ফসকে পড়ে ভেঙ্গে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পাত্রটির ভাঙা টুকরাগুলো একত্রিত করলেন, এরপর পাত্রের মধ্যে যে খাবার ছিলো তাও একত্রিত করতে লাগলেন ও বললেন- 'তোমাদের মা অতর্কিত আক্রমণ করেছেন। অতঃপর আনাস (রা:)খুব সতর্কতার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা:)যার ঘরে ছিলেন সেখান থেকে একটি ভালো পাত্র নিয়ে আসলেন। আর ভাঙ্গা পাত্রটি যে ভেঙ্গেছে তার ঘরেই রেখে দিলেন।'

মেলামেশার সুযোগ দিন

শিশুকে সঠিক পদ্ধতিতে সমাজের সঙ্গে মেলামেশা করতে অভ্যস্ত করা অভিভাবকের কর্তব্য। সমাজ-বিমুখ ও একগুয়েমীভাবে তার বিকাশ হতে পারবে না। অথবা সে ঘরমুখো হয়ে পড়বে যে তার বাবা অথবা বড় ভাইয়ের সঙ্গ ছাড়া বের হতে চাইবে না। শিশুকে নিরাপদ সময়ে বাড়ির নিকটবর্তী কোনো মুদি দোকানে যাওয়ার জন্য বের হতে ও সেখান থেকে বাসার কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে অভ্যস্ত করবে। এভাবেই তার দায়িত্ব পালনের ওপর অনুশীলন হতে থাকবে। অভিভাবকের পক্ষ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত ক্রয়-বিক্রয়ে শিশুর লেনদেন করা শরিয়তসিদ্ধ। তাকে পথ চলার নিয়মাবলী সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে যাতে কোনো দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হয়। সে শুধু সামনের দিকে তাকাবে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া পেছনে তাকাবে না। রাস্তা পারাপারের সময় একবার ডানে এবং একবার বামে তাকিয়ে নেবে যাতে কোন গাড়ি তাকে চাপা দিতে না পারে। রাস্তা পারাপারের সময় অপর শিশুদের সঙ্গে কথাবার্তায় মগ্ন হতে পারবে না। সহপাঠীর সঙ্গে পথের মধ্যে অবস্থান করবে না। বরং তার থেকে কাম্য দায়িত্ব পালন ও গৃহে প্রত্যাবর্তন তার কর্তব্য। সহপাঠীকে ঘরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করতে শিশুকে বারণ করবে না। তার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও অতিথির জন্য উপস্থাপনযোগ্য সামগ্রী তার সামনে পরিবেশন করতে নিষেধ করবেন না। অসুস্থ পড়শি অথবা সহপাঠীর সেবা-শুশ্রুষার জন্য যেতে অভ্যস্ত করবেন। কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতে কাঙ্ক্ষিত সুফল পেতে হলে অভিভাবক শিশুর সঙ্গে থাকা উচিত।

'আত্মমর্যাদাবোধ ও তার মতো লোকের ওপর নির্ভর করা যায়, যে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদন ও দায়িত্ব বহনের যোগ্য' এরকম চেতনাবোধ শিশুর মনে জাগ্রত করতে হবে। আমাদের সামনে কিছুক্ষণ পূর্বে এ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। আবু বকর (রা:) ও ওমর (রা:) একটি ছোট বালককে রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর নিকট পাঠালেন মধ্যমা নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে। আনাস (রা:) রাসূলুল্লাহ- (সা:)এর খেদমত করছিলেন যখন তার বয়স ছিলো মাত্র দশ বছর। কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনে রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে পাঠাতেন। ঐ কর্ম সম্পাদনে তার ওপর নির্ভর করতেন। উপরন্তু কোন গোপন বিষয়ে তাকে বিশ্বস্ত মনে করতেন। আনাস (রা:) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা:) আমার নিকট আসলেন আর আমি তখন ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করছিলাম। ফলে আমার ঘরে ফিরতে একটু বিলম্ব হয়ে যায়। অতঃপর যখন আমি বাড়ি পৌঁছলাম, আমার মা আমাকে বললেন- 'তোমার কি হলো? দেরি করে বাড়ি ফিরলে যে? আমি বললাম, 'রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাকে তাঁর একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন। মা বললেন, 'কি কাজে?' উত্তরে আমি বললাম, সেটা গোপন (বলা যাবে না) তখন আমার মা বললেন- 'রাসূলুল্লাহ - (সা:) এর গোপন বিষয় সম্পর্কে কারও সঙ্গে আলাপ করবে না যেন। আনাস (রা:) বললেন- ঐ প্রসঙ্গে আমি যদি কারও সঙ্গে আলোচনা করতাম, তাহলে তোমার সঙ্গে তা আমি অবশ্যই আলোচনা করতাম।

সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণে রাখুন

একজন প্রকৃত অভিভাবক কোন যুক্তিতেই শিশুর পর্যবেক্ষণকে অবহেলা করতে পারেন না। বরং তিনি শিশুকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখবেন। কিন্তু অবহেলার এমন কতগুলো প্রকার রয়েছে যে দিকে মানুষ ভ্রুক্ষেপই করে না বরং তারা এর উল্টো মনে করে। আমার নিকট তার বাস্তব উদাহরণ হলো, সন্তানদের অভ্যন্তরীণ আবাসিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তি করানো। যেখানে সপ্তাহে পাঁচ বা ছয় দিন তার মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। যেখানে সকল শিশু একসঙ্গে শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে থাকে। এখানে নামমাত্র উপকারিতা হবে ক্ষতিই অনেক বেশি হয়ে থাকে।

শুধু জ্ঞান অর্জনই সবকিছু নয়। মা-বাবা চোখের সামনে শিশুর বিকাশ তার চেয়ে অনেক অনেকগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, শিক্ষায় অসংখ্য মেধাবী মুখ এসব বিদ্যালয়ের বাইরে থেকেই আবির্ভূত হয়।

আলেমদের বৈঠকে বসার সুযোগ করে দিন:

অনেক মানুষ আছেন যারা অবুঝ শিশুদের প্রতি যতটুকু লক্ষ্য রাখেন এ বয়সের শিশুদের প্রতি ততটুকু ভ্রুক্ষেপ করেন না। ফলে তাদের আলেম ওলামা ও বড়দের মজলিসে যেতে বারণ করে থাকেন। শিক্ষামূলক সেমিনারে উপস্থিত হতেও নিষেধ করেন তা ধারণ করতে তাদের অসমর্থতার আশঙ্কায়। যখন মজলিসে কাঙ্ক্ষিত অতিথি শুভাগমন করেন তখন বুঝমান শিশুদের মজলিস থেকে বের করে দেয়া হয় এবং তাদের সাক্ষাৎকার থেকে শিশুদের বঞ্চিত রাখা হয়। অনেকে তো খুবই অতিরঞ্জিত করে ফেলেন। শিশুদের একটি কক্ষের মধ্যে বন্দি করে অতিথি বের হওয়া পর্যন্ত তালাবদ্ধ করে ফেলেন। এগুলো সবই স্বাভাবিকতার ওপর অতিরঞ্জন। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, এতো কিছুর পরও তারা এটাকে শিষ্টাচার হিসেবে গণ্য করে। বরং প্রকৃত শিষ্টাচার ও সঠিক তৎপরতা হলো অভিভাবক শিশুদের এ জাতীয় মজলিসের উপস্থিত হওয়ার জন্য সুযোগ করে দেবেন। ফলে তারা সেখান থেকে কথা বলার শিষ্টাচার শিক্ষা করতে পারবে। শিখতে পারবে মজলিসের আদব ও শ্রবণ করার আদব। শুধু ঐ কথাগুলোই তারা শুনবে যা দ্বারা তারা উপকৃত হতে পারবে। অনুরূপ আচরণ বালিকাদের সঙ্গেও করতে হবে মহিলাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়। শিশুদের মনের মধ্যে এ সকল মজলিসে উপস্থিত হওয়ার একটা ভালো প্রভাব পড়বে। কারণ তারা তখন উপলব্ধি করতে পারবে যে, তারা প্রাথমিক শৈশব স্তর অতিক্রম করেছে। ফলে তাদের পরবর্তী স্তরের যোগ্য করে তুলতে খুব দ্রুত কাজ করবে। কোন মজলিসই এ সুবিধাগুলোর আওতামুক্ত নয়। শুধুমাত্র ঐ বিশেষ মজলিসগুলো ব্যতীত যা শুধু বয়স্কদের জন্য। যেমন হিজরতের হাদিসে সংঘটিত ঘটনা: যখন রাসূলুল্লাহ (সা:) আবু বকর - (রা:) এর নিকট এমন এক মুহূর্তে গমন করলেন যে সময় ইতিপূর্বে কখনও যাননি। রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে বললেন, 'তোমার কাছে যারা আছে তাদের বেরিয়ে যেতে বলো। উত্তরে আবু বকর (রা:) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা:) তারা হলো আমার কন্যাদ্বয় আয়েশা আনয়া ও আসমা। আরো বললেন, 'আমি তাদের জ্ঞাত করেছি যে, আমার হিজরতের অনুমতি হয়ে গেছে।' সালাফে সালেহীন আপন সন্তানদের সভা-সেমিনারে উপস্থিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। তখন তো শিশুরা বড়দের সঙ্গে বসার আদব-কায়দা বেশ ভালোভাবে রপ্ত করতে পেরেছিলেন। তারা চুপ থাকতো, মনোযোগ সহকারে শুনতো ও কোন কথা বলতো না। এমনকি আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তাদের জানা থাকলেও। তবে কোন কোন সময় তাদের থেকে কিছু বলার ইচ্ছে অথবা অনুরোধ করা হতো। সামুরা বিন যুন্দুব-(রা:) এর দিকে লক্ষ্য করুন। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ- (সা:) এর যুগে একটি বালক ছিলাম। আমি তাঁর থেকে হাদিস সংরক্ষণ করতাম। সেখানে আমার চেয়ে বয়স্ক লোকদের উপস্থিতি ভিন্ন অন্য কিছুই আমার কথা বলার অন্তরায় হয়নি।' অনুরূপ আব্দুল্লাহ বিন ওমর-(রা:)এর মজলিসের আদব রক্ষার একটি ঘটনাও বিবৃত রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ-

(সা:) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, ইতোমধ্যে 'যুমার' আনা হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন- 'এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে যার উদাহরণ হলো মুসলমানের মতো। তখন আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, সেটা খেজুর গাছ। তথাপিও আমি উপস্থিত সকলের চেয়ে বয়সে ছোট বলে নীরব থাকলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, 'তা হলো খর্জুর বৃক্ষ।' আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা:) যখন দেখতে পেলেন যে, তিনি সকলের চেয়ে বয়সে ছোট অথচ সেখানে আবু বকর ওমর-(রা:)এর মতো শীর্ষ স্থানীয় সাহাবীও উপস্থিত রয়েছেন একথা ভেবে চুপ থাকলেন।

যোগ্যতা অর্জনে উৎসাহ প্রদান

সাধারণতঃ মুসলিম বিশ্বের একটি শিশু স্কুলে যাতায়াত করা ব্যতীত কোন কাজ করে না। কিন্তু কিছু হতদরিদ্র সন্তানের ক্ষেত্রেও যে এর ব্যতিক্রম হয় না, এমনটি নয়। যারা এক মুঠো জীবিকার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকে। তারা কোন কর্মই উত্তমরূপে সম্পন্ন করতে পারে না। যদিও তা একবারে ক্ষুদ্র হয়।

গৃহস্থালির এমন অনেক প্রয়োজনীয় কাজ রয়েছে যা কন্যা শিশুরাই করতে সক্ষম, যদি তাদের এ বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এটা বোধগম্য নয় যে, ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হওয়া পর্যন্ত সার্বক্ষণিক পড়াশুনার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে, যতক্ষণে তার বয়স হবে আনুমানিক তেইশ বছর। এরপর যে কোন কর্মই আর উত্তমরূপে সম্পন্ন করতে পারবে না। ফলে সে মা-বাবার ওপর বোঝা হয়ে থাকবে। অতএব শিশুকে সুযোগ করে গড়ে তোলার ব্যাপারে অভিভাবককে যারপর নাই তৎপর হওয়া উচিত। অর্থাৎ তাকে যে কোন কর্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন করার যোগ্য করে গড়ে তোলা। ফলে এর দ্বারা সে নিজে উপকৃত হতে পারবে এবং সমাজেরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। প্রকাশ থাকে যে, সম্পাদনযোগ্য কর্মসমূহ সম্পন্ন করার জন্য শিশুর শরীর ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠে।

দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিন

শিশুকে এ বয়সে কোন দায়িত্ব গ্রহণে অংশীদার করা উচিত। এ দিকে তাকাবেনা যে, সে এখনও ছোট। বিশেষতঃ এ স্তরের শেষের দিকের সময়গুলোতে। পক্ষান্তরে যদি তাকে কোন দায়িত্বভার গ্রহণে অংশীদার না করা হয় অথচ সে এক পৌরুষের সমপর্যায় পৌছার প্রায় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। তাহলে আর কবে সে এ দায়িত্বভার গ্রহণ করবে? অতএব শিশুকে এ ব্যাপারে সচেতন করা অভিভাবকের কর্তব্য। যেমন:

১. তাকে এক দিনর স্থলে একসঙ্গে সপ্তাহের খরচার টাকা দিয়ে দিবে। সেখান থেকে প্রয়োজন সাপেক্ষে সে ব্যয় করবে। এবং খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে।

২. কোনো কোনো কাজে মতামত চাইবে ও তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তার মতের ব্যাখ্যা করবে। তার সব কথা খাটবে না। একাধিক বিকল্পের মধ্যে যে কোনো একটা নির্বাচনের সুযোগ দেবে।

৩. এবং তার কাছ থেকে কোন কর্ম সম্পাদনের প্রতিশ্রুতি নেবে।গৃহস্থালী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কোন কাজের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করবে। কিন্তু এটাকি কল্পনা করা যায় যে, শিশু প্রথম বারেই কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতিতে উক্ত কর্মটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে? নিঃসন্দেহে এমন আশা পোষণ সুদূর পরাহত। সুতরাং কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যেতেই পারে। এ ব্যাপারে অভিভাবককে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ, কোনো কর্মের সূচনা এমনই হয়। সে কারণে এ ধরনের পরিণতিতে অভিভাবককে ইমোশনাল হয়ে শিশুকে শাস্তি দেয়া অথবা তাকে অর্পিত কাজটি প্রত্যাহার করে নিলে চলবে না। বরং শিশুকে এ ক্ষেত্রে সঠিক পথটি দেখাতে হবে এমন পদ্ধতিতে যা তার জন্য অপমান ও তার ব্যয়িত শ্রমকে তাচ্ছিল্যের কারণ না হয়ে দাঁড়ায় এবং তার সঙ্গে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে, সমাধানের জন্য কাজ করবে। তবে এ প্রেক্ষিতে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হলো তাকে কোনো বড় বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ অথবা যে কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন ভুল হয় সেই কাজের দায়িত্ব অথবা প্রতিনিধিত্ব তাকে দেবে না। বরং দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথমে ছোট ছোট কর্ম দিয়ে সূচনা করবেন। এমনিভাবে এক পর্যায়ে যখন সেটা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে ও সঠিকভাবে তা সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে তখন তার ওপর বড় ও মহৎ কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা যাবে।
যেসব কাজের দায়িত্ব শিশুর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে সে ব্যাপারে তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভ্যস্ত করা উচিত। যাতে প্রতিটি ব্যাপারে তাকে অভিভাবকের দিকে ফিরে আসতে না হয়। এমনিভাবে অভিভাবকের জন্য শিশুর প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ধারিত করে দেয়া উচিত নয়। তার প্রতিশ্রুত কর্ম সম্পাদনে স্বাধীনতা দেয়া উচিত। বরং 'শিশু করতে সক্ষম নয়' এমন কোন কর্ম সম্পর্কে যদি তার এ রকম প্রবল ধারণা হয় কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে তাকে পথ নির্দেশনা দিলেই চলবে। তবে অবশিষ্ট কাজ-কর্মে তাকে শুধু সংক্ষিপ্ত দিক নির্দেশনা দিলেই চলবে। ফলশ্রুতিতে শিশু সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্ম- সমূহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

পক্ষান্তরে শিশুর ছোট বড় প্রতিটি পদক্ষেপে অভিভাবকের দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রতি তার অতিশয় আগ্রহ এ জাতীয় প্রতিটি ব্যাপারে দিক নির্দেশনার মাধ্যমে শিশুকে পরিপূর্ণরূপে আবদ্ধ করে রাখা

ও পছন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেবে ফলে তখন দায়িত্বভার প্রদানটা হবে অনর্থক ও অকার্যকর।

প্রতিযোগিতার প্রতি উৎসাহ দিন

এ বয়ঃস্তরে তরুণের শরীরে যে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি সাধিত হয় ও তার নিকট গবেষণা করার যে ক্ষমতা অর্জিত হয়, তা-ই নিজের কাছেও ঐ শক্তি ও সামর্থ্যে অনুভূতির জন্ম দেয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَ شَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرِ. ُ

সূরা রুম :৫৪

'আল্লাহ, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। **১১২**

শৈশবের দুর্বলতা থেকে ক্রমান্বয়ে তারুণ্য ও যৌবন শক্তির দিকে সে ধাবিত হয়। শক্তি ও সামর্থ্য অনুভূতি তাকে অগ্রগামিতা ও কষ্টসাধ্য কর্ম সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করে। অধিকাংশ সময় সে প্রতিকূলতার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না। এটা তার ভালো একটি দিক যদি তরুণটি সত্যাশ্রয়ী হয়। পক্ষান্তরে আবেগ তাড়িত হয়ে যদি সঠিক দিক-নির্দেশনা থেকে দূরে সরে যায় তাহলে এটা হবে তরুণটির ধ্বংস ও বিনাশের চাবি। অতএব, অভিভাবককে এক্ষেত্রে খুবই সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে যাতে তিনি তরুণকে কল্যাণের পথে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

সর্বকালেই এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে একাধিক সাহাবায়ে কেরাম জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন অথচ এরপর তারুণ্যে গমন করেছেন। তারা এক্ষেত্রে যার পর নাই উদগ্রীবও ছিলেন বটে। এমনকি তারা যুদ্ধে। অংশ্রগ্রহণের জন্য নিজিদের বয়স বেশি দেখানোর কৌশল অবলম্বন করতেন। সামুরাহ বিন যুনদুব কম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার মা বিধবা হওয়ার পর তিনি মদিনায় চলে এলে লোকেরা তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। এরপর তিনি বলেন, 'এই অনাথের দায়িত্বভার যে ব্যক্তি গ্রহণ করতে রাজি হবে আমি শুধু তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি। অতঃপর তাকে এক আনসারি বিবাহ করলো। তিনি (হাদিসের বর্ণনাকারী) বলেন,

'প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনসারী বালকদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য পেশ করা হতো। তখন রাসূলুল্লাহ সা যাদের বয়স হয়েছে তাদের মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীতে তালিকাভুক্ত করে নিতেন। তিনি (হাদিসের বর্ণনাকারী) বলেন, 'আমাকে এক বছর পেশ করা হলো। তখন এক বালককে ভর্তি করা হলো আর আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ওকে ভর্তি করে নিলেন আর আমাকে প্রত্যাখান করলেন। অথচ আমি তার সঙ্গে কুস্তি ধরে তাকে ধরাশায়ী করতে পারি। অতঃপর রাসূল বললেন- 'তাহলে দেরি করছো কেনো? কুস্তি ধরেই দেখাও না, অতঃপর আমি কুস্তি ধরে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলি। ফলে রাসূলুল্লাহ আমাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আব্দুল্লাহ বিন ওমর থেকে প্রভূণিত, উহুদের দিন তাকে রাসূল এর নিকট উপস্থিত করা হলো, অথচ সে তখন চৌদ্দ বছরের কচি বালক। তাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। এতঃপর দ্বিতীয় বার আমাকে খন্দকের দিন পেশ করা হলো, অবশ্য তখন আমার বয়স পনের বছর পূর্ণ হয়েছিল। তখন আমাকে অনুমতি দেয়া গুলো। (হাদিস বর্ণনাকারী) নাফে' বলেন, 'আমি ওমর বিন আব্দুল বাপজিজের দরবারে গোলাম, যখন তিনি মুসলিম জাহানের সম্রাট। অতঃপর এ হাদিসটি তার নিকট বর্ণনা করলে তিনি সকল প্রাদেশিক গভর্নরদের নিকট শাহী ফরমান লিখে পাঠালেন- 'পনের বছর পূর্ণ হয়েছে এমন বালকদের জন্য সেনাবাহিনীর তহবিল থেকে ভাতা নির্ধারণ করে দেয়া হোক।' রাসূলুল্লাহ মায়া উসামা বিন যায়েদ এর হাতে আঠারো অথবা বিশ বছর বয়সে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। এর বিপরীতে আমরা দেখতে পাই অসংখ্য অপরাধ যা এমন লোকদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে যারা জীবনের এ ঈর্ষণীয় ও প্রসন্ন বয়সে উপনীত। এ প্রেক্ষাপটে এ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বয়সকে যথাযথ ব্যবহার করে শ্রমসাধ্য কল্যাণকর কর্ম সম্পাদনের জন্য তরুণকে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এখান থেকে উপকৃত হওয়া অভিভাবকের কর্তব্য। না দেখে না বুঝে কোনো কাজে আসক্ত হওয়া ও নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া হতে তাকে সতর্ক করতে হবে।

সন্তান ছোট-খাটো কিছু চুরি করলে যা করনীয়:

আপনারা হয়তো এ গল্পটি শুনেছেন যে, এক মহিলার এক ছেলে ছিল। ছেলেকে সে খুবই ভালোবাসতো। ছেলেটি যখন স্কুলে যেতে হলে করলো তখন স্কুল থেকে সে অন্য ছেলেদের পেন্সিল, কলম, নোটবুক, খাতা ইত্যাদি চুরি করতে লাগলো। মা ছেলেকে কখনো একথা জিজ্ঞেস করতো না যে, সে এ সকল জিনিস কোথা থেকে আনে। এতে ক্রমান্বয়ে তার সাহস বেড়ে যেতে লাগলো। চুরি করার অভ্যাস পাকা-পোক্ত হতে লাগলো। এরপর সে বড় বড় জিনিস চুরি করা শুরু করলো। প্রাপ্তবয়স্ক হলে সে এক বড় ডাকাত রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। একবার সে তার বন্ধুদের সাথে এক গ্রামে ডাকাতি করতে গেল। সেখানে তারা অনেক লোককে হত্যা করলো।

পুলিশ অনুসন্ধান শুরু করে তাকে গ্রেফতার করে ফেললো। মকদ্দমার রায় মোতাবেক তার ফাঁসির হুকুম হলো। ফাঁসির সময় উপস্থিত হলে সে বললো, 'আমি আমার মাকে একটা কথা বলতে চাই। তাকে অনুমতি দেয়া হলো। মা-তো কাঁদতে কাঁদতে নিঃশেষ। সে মা'র নিকট গিয়ে মায়ের কানে কানে বললো, দেখো তোমার কারণেই আজ আমার এ শাস্তি। একথা বলে সে দাঁত দ্বারা মায়ের কান কামড়ে ধরলো। উপস্থিত সবাই যুবককে গালমন্দ করে বলতে লাগলো শেষ মুহূর্তে এরূপ কী করছো? তখন ঐ যুবকটি বললো, 'মায়ের কারণেই আজ আমার ফাঁসি হতে চলেছে। কারণ, আমি যখন স্কুল থেকে পেন্সিল, কলম ইত্যাদি চুরি করে আনতাম তখন মা আমাকে বাধা দিত না। যদি প্রথম থেকেই আমাকে এগুলো করতে বাধা দিত এবং ছাড়তে বাধ্য করতো, তাহলে আজ এ মুহূর্ত আসত না। এ কাহিনীটির মূল শিক্ষা হলো- সন্তান বিপথে গমন অথবা সংশোধন অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়ের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

অন্যায় থেকে ফেরানোর চেষ্টা করা:

প্রকাশ থাকে যে, শিশু শরিয়তের বিস্তারিত বিধানাবলি পালনে আদিস্ত নয়। আল্লাহ তা'আলা যা নিষিদ্ধ করেছেন যদি সে এমন কর্মও করে বসে তবুও তার আমলনামায় পাপ লেখা হবে না। তথাপিও অভিভাবকদের কর্তব্য হলো শিশুকে নিষিদ্ধ কর্মসমূহ থেকে ফিরিয়ে রাখা। শিশু আদিষ্ট নয় বলে তাকে যেন এক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শনে উদ্যত না করে। যাতে সে পাপকর্মে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে না পারে। ফলে অর্থহীন ও নিষ্ফল কর্মে শিশুর মূল্যবান জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর সে তা হতে আর মুক্ত হতে পারবে না। অতঃপর এটা তার নির্ঘাত ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। ইবনে কাইয়ুম বলেন, আলাইহি 'শিশু বুদ্ধিসম্পন্ন হলে অন্যায় ও অনর্থক আসর, গানবাজনা, অশ্লীল ও উদ্ভট কথা শ্রবণ ও মন্দ কথন থেকে দূরে রাখা অভিভাবকের কর্তব্য। কারণ সে যদি তার কানের সঙ্গে একবার এর সম্পর্ক করে নিতে পারে তাহলে বড় হলে শিশুর পক্ষে তা বিচ্ছিন্ন করা কঠিন হয়ে যাবে। অভিভাবকের পক্ষেও তাকে ওখান থেকে উদ্ধার করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে বৈকি। এ ধরণের পথভ্রষ্টকে পরিবর্তন করা সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। কারণ তখন আরেকটি স্বভাব প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হবে। বলাবাহুল্য অসংখ্য উপকরণ প্রচলিত রয়েছে যার মাধ্যমে শিশুর নিকট অন্যায় ও অনর্থক বিষয় পৌঁছে যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পর্ণ, ম্যাগাজিন, অশ্লীল চ্যানেল, কাল্পনিক গল্প ও অসংখ্য বিকৃত মিডিয়া। অভিভাবক যখন এসকল সামগ্রী গৃহে অনুপ্রবেশ না করাতে সক্ষম হবেন, তখনও তাকে অন্য আর একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তা হলো-শিশু যদি অন্য কোন উপায়ে ঐ বস্তু সামগ্রীর নাগাল না পায়। চাই সেটা তার বন্ধু অথবা সহপাঠীদের সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমে হোক অথবা তাদের কাছ থেকে ধার নিয়ে তা নিজের ঘরে উপস্থিত করে হোক। শিশুকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। মোটকথা হলো, সন্তানের সঙ্গী নির্বাচনে অভিভাবকের ভূমিকা রাখা একান্ত কর্তব্য।

প্রয়োজনে শিশুকে শাস্তি দিন:

স্নেহ-ভালোবাসার পাশাপাশি শিশুকে মাঝে মাঝে শাস্তির মুখোমুখি দাঁড় করাতে হবে। 'শিশু শরিয়ত কর্তৃক আদিষ্ট নয়' যুক্তিতে তাদের সকল ভুলত্রুটি ও অন্যায় কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে তাদের ভালোভাবে শিক্ষা-দিক্ষা সম্ভব হবে না। এমনিভাবে তার থেকে সংঘটিত প্রতিটি ভুলের জন্য শাস্তি দেয়া অথবা ভুল-ত্রুটির মাঝে বিদ্যমান নিশ্চিত পার্থক্য ও প্রকরণ উপেক্ষা করে সকল ভুল-ত্রুটিকে একই মাপকাঠিতে বিচার করা অথবা একই দৃষ্টিতে দেখা এবং শাস্তি প্রদান তথা শারীরিক শাস্তি প্রদানই উত্তম বলে সিদ্ধান্ত হবে, তখন তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে। যাই হোক ছোট্ট বয়সে শিশুর শারীরিক শাস্তি কাম্য নয়। তাছাড়া এর অনেক ক্ষতিকর দিকও রয়েছে।

ইবনে খালদুন রহমাতুল্লাহি তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন আলাইহি 'ছাত্রদের ওপর কঠোরতা আরোপ তাদের জন্য ক্ষতিকারক। কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানে সীমালঙ্ঘন শিক্ষার্থীর জন্য ভীষণ ক্ষতিকারক। বিশেষ করে ছোট ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে। কারণ এটা হলো মন্দ প্রবণতা। যে অভিভাবক প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কঠোরতা ও রুক্ষভাব প্রদর্শন করে থাকেন তার ছাত্র, অধীনস্থ ও গৃহ পরিচারিকাদের প্রতি। তাহলে সে কঠোরতা শিশুর মন সংকীর্ণ হয়ে যাবে ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। কাপুরুষতা ও অলসতার দিকে তাকে ধাবিত করবে, মিথ্যা ও দুষ্টামির দিকে তাকে উৎসাহিত করবে।
তার প্রতি কঠোরতার হাত সম্প্রসারিত হতে পারে, এ আশঙ্কায় অন্তরে যা আছে তার বিপরীত সে প্রকাশ করবে। এটা তাকে প্রহসন ও প্রতারণা শিক্ষা দেবে। একপর্যায়ে এটা তার অভ্যাস ও চরিত্রে পরিণত হয়ে যাবে। ফলে মানবতার মর্মবাণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে; যার জন্য একটি সমাজ ও সভ্যতা গড়ে ওঠে।

পরিবার হলো তার প্রাণ ও গৃহের প্রতিরক্ষা। এক্ষেত্রে সে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। বরং উত্তম গুণাবলি ও নান্দনিক চরিত্র অর্জনে সে হবে ব্যর্থ এবং মানবতার দাবি পূরণে অসমর্থ। অতঃপর সে এতো নীচে নেমে যাবে যে, সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণি থেকেও নিচে চলে যাবে।

এমনটি ঘটেছে প্রতিটি জাতির বেলায়, যারা আধিপত্যবাদের কবলে চলে গেছে। ফলে সেখান থেকে শুধু অত্যাচার-অবিচার ও নিপীড়নই চলছে অব্যাহতভাবে। একে আপনি পরাধীন গণ্য

করতে পারেন। শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষকের ও সন্তানের ক্ষেত্রে পিতার কর্তব্য হলো তাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী বা কঠোর না হওয়া।'

শাস্তি দানের পর শিশুকে আশ্রয় দিন:

শাস্তি প্রদানের সময় কখনও এমন হয় যে, শিশু যার কাছে সাপোর্ট পাবে বলে মনে করে তাকে জড়িয়ে ধরে। তার কাছেই আশ্রয় নেয়।

বাবার নিকট আশ্রয় নেয়, যদি শাস্তিটা মায়ের পক্ষ থেকে হয়। ঠিক যদি শাস্তিদাতা বাবা হন তখন মা অথবা কোনো নিকটাত্মীয়ের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতএব যিনি শাস্তি প্রদানের নিয়ত করেছেন তার থেকে শিশুর আশ্রায়দাতাকে কোনো অবস্থাতেই অবমূল্যায়ন করা ঠিক হবে না। বরং শাস্তি থেকে এমনভাবে হাত গুটিয়ে নেবে যেন কিছুই ঘটেনি। অন্যথায় শিশুর নিকট আশ্রয়দাতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। বরং এ প্রেক্ষিতে তার নিকট স্পষ্ট করতে হবে যে, সে শাস্তিযোগ্য অপরাধই করেছে বৈকি। তবে যার আশ্রয় নিয়েছে তাকে যদি আজ জড়িয়ে না ধরতে তাহলে তাকে অবশ্যই শাস্তিটা পেতে হতো অথবা তার সঙ্গে ভিন্নরূপ আচরণ করা হতো।
এক প্রকারের আশ্রয় হিসেবে শিশু কখনও কুরআন শরীফ স্পর্শ করে থাকে তার মা-বাবার নিকট কুরআনে কারীমের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে তার অবগতির কারণে। যেহেতু তাদের প্রতিনিয়ত কুরআনে কারীম অধ্যয়ন ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে দেখে। সুতরাং অভিভাবকের জন্য ক্রোধ তাড়িত হয়ে শিশুকে শাস্তি দেয়া উচিত হবে না। বরং তার অনিবার্য কর্তব্য হলো, এ দিকটাকে মূল্যায়ন করা এবং 'সে এক দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে' এ মর্মে শিশুর অন্তরে কুরআনে কারীমের মর্যাদা ও মহত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তা না হলে তিনি তাকে অবশ্যই শাস্তি দিতেন। যদি এমন হয় শাস্তি প্রদানের কোনো বিকল্প নেই, তাহলে প্রথমে তাকে কুরআন শরীফ যথাস্থানে রেখে আসতে নির্দেশ করবে, তারপর তাকে শাস্তি দেবে। অথবা তাকে বলবে: তোমার কৃতকর্মের জন্য অবিলম্বে তোমাকে জবাবদিহি করবো, কিন্তু কুরআন শরীফ দেয়ার পর; আমি এমন একটি সময়ের অপেক্ষায় আছি যখন তুমি এর থেকে অনেক দূরে থাকবে।

কখনও বা শিশু আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকের কর্তব্য হলো রাসূলুল্লাহ (সা:)এর কথা 'কেউ আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমাদের নিকট কিছু চাইলে তাকে দিয়ে দাও এবং তোমাদের থেকে যে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দাও! এর অনুকরণে তাকে শাস্তি দেয়া হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে। কখনও এমন হয় যে, শিশু নামাযের

মাধ্যমেও আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে নামাযের ক্ষেত্রে যে পথ অবলম্বন করেছে এখানেও সেই একই পথে তাকে চলতে হবে। এমতাবস্থায় আবেগতাড়িত হয়ে শিশুকে নামায থেকে টেনে বের করা ও তাকে শাস্তি দেয়া অভিভাবকের জন্য চরম অন্যায়। কারণ এ জাতীয় কর্মের দ্বারা শিশুর অন্তর থেকে ইবাদতের ভাব-গাম্ভীর্য বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রকৃত বাস্তবতা হলো শিশুর থেকে এ ধরনের তৎপরতার মধ্যে অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। কারণ অভিভাবক ক্রোধান্বিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দিলে তাতে শিশুর অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সে কারণে এ অবস্থায় শাস্তি না দিয়ে বরং এ পরিমাণ কালক্ষেপণ করা উচিত যাতে ক্রোধের তীব্রতা প্রশমিত হয়ে যায়।

কথা অথবা কর্মের বিরোধিতার শাস্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই যার কারণ ইচ্ছেকৃত অবাধ্যতা ও যার কারণ ভুলক্রমে অবাধ্যতা এ দুয়ের মধ্যে
পার্থক্য নির্ণয় করা একান্ত কর্তব্য। কারণ সকল অপরাধ মূল্যায়নের ক্ষেত্র সমান নয়; মূর্খতা ও অজ্ঞতার সমাধান হলো শিক্ষা, শাস্তি নয়।

'যে সকল সংঘটিত অবাধ্য কথা ও কর্ম মূর্খতা বা অজ্ঞতার ফসল তাতে কোনো শাস্তি নেই' যখন এটা মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত হয়ে গেলো। তাহলে সে কথা বা কর্ম থেকে যথাযথ পন্থায় বিরত রাখা বা নিষেধ করা এর পরিপন্থী নয়। লক্ষ করুন, এ লোকটি কোন শিশু ছিল না। ছিল একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ। এখানে রাসূলুল্লাহ এ বিষয়টির প্রতিকারের জন্য শুধু একটিই ভূমিকা নিয়েছিলেন। তা হল, তাকে নামাযের নিয়মাবলি শিক্ষা দেয়া। তিনি বললেন- 'নিশ্চই মানুষের সঙ্গে যেরূপ কথা বলা হয় নামাযের মধ্যে সেই কথা বলা যায় না। বরং নামায হলো তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াত।' রাসূলুল্লাহয় এর এই পদক্ষেপে মুগ্ধ হয়ে সাহাবি তার সঙ্গে সংযুক্ত করে বলেছেন, সাল্লাল্লাহ যখন রাসূলুল্লাহ সাহা আলাহার সবেমাত্র নামায সমাপ্ত করেছেন; 'আমার মা-বাবা তাঁর জন্য উৎস্বর্গ হয়ে যাক! তাঁর পূর্বে তার চেয়ে উত্তম শিক্ষক জীবনে আমি দেখিনি। আল্লাহর শপথ! তিনি আমার প্রতি কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।

শাস্তির উদ্দেশ্য হবে সংশোধন:

শাস্তি প্রদানের সময় অভিভাবকের স্বেচ্ছাচারিতা ও কঠোরতা কিছুই শিশুকে বুঝতে দেয়া উচিত হবে না। বরং তাকে বুঝাতে হবে যে, শাস্তিটা হলো শুধু মমতা ও অনুগ্রহ প্রকাশসহ তার আচরণ সংশোধন ও পুনরায় ভুলটি না করার জন্য। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় নবী -এর আদর্শ প্রণিধানযোগ্য। তিনি যখন দেখতে পেলেন- জৈনিক সাহাবি একজন মদ্যপানকারীকে গালি দিচ্ছে, দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়েছে; নিষেধ করলেন। আবু হুরাইরা মদ্যপানের অপরাধে ইতোমধ্যে যার ওপর তখন রাসূলুল্লাহ তাকে গালি দিতে থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ-এর নিকট মদ্যপায়ী

জনৈক ব্যক্তিকে আনা হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করলেন- 'তাকে তোমরা প্রহার করো! ফলত আমাদের মধ্যে কেউ হাত, কেউ জুতা আবার কেউবা নিজের কাপড় দিয়ে প্রহার করতে লাগলো। যখন সকলে শাস্তি প্রদানের কাজ সম্পন্ন করলো। তখন তাদের মধ্য হতে কেউ বলে উঠলো আল্লাহ তা'য়ালা তোকে অপমানিত করুন! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন- 'তোমরা এরূপ বলো না! তার বিরুদ্ধে তোমরা শয়তানকে সহায়তা করো না। বরং তোমরা বলো। আল্লাহ তা'য়ালা তোমার প্রতি দয়া করুন।'

উল্লেখ থাকে যে, অভিভাবক শিশুর প্রতি স্নেহ-মমতার অনুভূতি জাগ্রত করার ক্ষেত্রে যে ভুল-ত্রুটিগুলো করে থাকেন তার মধ্যে অন্যতম হলো: শাস্তিদানের পর সঙ্গে সঙ্গে তাকে আদর করতে তৎপর হওয়া। কখনও বা তাকে কিছু প্রদান অথবা কয়েক টুকরা মিষ্টি বা চকলেট ক্রয় করে দেয়া ইত্যাদি। এটা শাস্তির প্রত্যাশিত ফলাফলকে বিনষ্ট করে দেয়।

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার বর্জনীয় দায়িত্ব

মোবাইল না দেওয়া:

বর্তমান যুগে মোবাইল এর নেশা এক মহামারির আকার ধারণ করেছে।এর প্রভাব বাচ্চাদের মাঝেও কম না।ছোট ছোট বাচ্চারা আজ মোবাইলে মুখ গুজে পড়ে থাকে,তারা খেলাধুলা করতে চায় না, বাহিরে যেতে তাদের ভালো লাগে না, আত্মীয় স্বজনদের সাথে তারা কথা বলতে সাচ্ছ্যন্দবোধ করে না, সেজন্য আমরা মা বাবা এবং পরিবার এর সদস্যরাই দ্বায়ী।
বাচ্চা খাচ্ছে না একটু মোবাইল নেও;
কান্না করছে মোবাইল নেও;
কোনো কিছু নিয়ে বায়না করছে মোবাইল নেও;
অনেক তো হলো আর কত, আমরা কবে নিজদের ভালোটা বুঝব? নিজের বাচ্চাকে কেন আমরা অসুস্থ করে ফেলছি?আমার বাচ্চা একবার না খেলে মারা যাবে না,ক্ষুধা লাগলে এমনি খাবে, কান্না করলে তার আহামরি কোন অসুবিধা হবে না, কিছুক্ষন পর এমনিতেই কান্না বন্ধ করবে।বাচ্চার হাতে মোবাইল না দিয়ে তাকে খেলাধুলা করতে,বই পড়তে, ক্যালিগ্রাফি, সামাজিক কাজকর্মে অভ্যস্ত করে তুলতে পারি।বাবা মা এর উচিৎ নিজেরা মোবাইল আসক্তি দূর করা এবং যথাসম্ভব বাচ্চাদের সামনে ব্যবহার না করা।বাবা মা সারাদিন যদি বাচ্চাদের বলে মোবাইল ধরোনা, মোবাইল পঁচা জিনিস,আর নিজেরাই যদি দেদারসে মোবাইলে ডুবে থাকে তাহলে সেই বাচ্চাকে কখনোই ফোন থেকে দূরে রাখতে পারবে না।

নোংরা ভাষায় কথা না বলা:

সন্তান এর সাথে কখনোই নোংরা ভাষায় কথা বলা উচিত নয়।আমি যে ভাষায় কথা বলব আমার সন্তানও সেই ভাষায় কথা বলবে। বাচ্চারা দুষ্টমি করবে,কথা শুনতে চাইবে না,বারবার একই ভুল করবে একারণে রাগ করে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা কোনোভাবেই পিতা মাতার জন্য শোভনীয় নয়। তখন আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত আমি কি আমার রবের সব হুকুম আহকাম মেনে চলি?আমি কি আমার রবের আনুগত্য করি? যদি উত্তর না হয় তাহলে যেখানে আমি নিজে আমার রবের হুকুম পালন করি না যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক সেখানে আমি এক অধম বান্দা-বান্দী হয়ে কীভাবে আশা করি যে আমার সন্তান আমার কথা শুনবে!আমি যদি আমার রবের পুরোপুরি আনুগত্য করি তাহলে আমার বাচ্চা অটোমেটিকলি আমার কথা শুনবে ইনশাআল্লাহ। তাই সর্বচ্চ সবরের সাথে এই সময় গুলো মোকাবিলা করতে হবে। এতে আল্লাহর তরফ থেকে অসংখ্য নেকি পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

সব আবদার পূরন না করা:

সন্তান যখন যা চায় সাথে সাথেই সেটা দেয়া ঠিক না।ছোট মানুষ বোঝে না কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল আর তাছাড়া চাওয়ার সাথে সাথে সবকিছু পাওয়ার অভ্যাস হয়ে গেলে সন্তান যখন বড় হবে তখন আমি,আপনি ই বিপদে পড়ব।বর্তমানে একটা প্রচলন শুরু হয়েছে দেখা যায় অনেক বাবা মা অহংকার করে বলে আমার বাচ্চা কিছু বলার আগেই ওর সামনে সব হাজির করি,এতো হাজার টাকার নিচে কোনো খেলনাই কিনি না,এই ব্রান্ড এর ড্রেস ছারা পরাইনা। তাদের উদ্দেশ্য বলতে চাই; আপনি আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ বরবাদ করে দিচ্ছেন না তো? একটু ভাবার বিষয়। এই অসুস্থ মনমানসিকতার প্রতিযোগিতা থেকে আল্লাহ সকল বাবা মাকে হেফাজত করুন আমিন।

অতিরিক্ত আদর পরিহার করুন:

প্রত্যেক পিতা-মাতাই তার সন্তানকে আদর ও সোহাগ করেন, যা প্রত্যেক পিতা-মাতার সহজাত প্রবৃত্তি। পিতা-মাতার এ আদর ও মায়া পরবর্তীতে কোনো কোনো সন্তানের জন্য উপকারী হয়, আবার কারও কারও জন্য অপকারীও হয়। এর প্রকৃত কারণ হলো, স্থান ও পাত্র সম্পর্কে জানা না থাকা। যে সময়টিতে বাচ্চাকে সোহাগ করা দরকার ছিল, তখন শাসন করে, আর যখন শাসন করা দরকার, তখন সোহাগ করে ক্ষতি করা হয়ে থাকে। যেমন কারও বাড়িতে দাওয়াত করা হলো, সেখানে মজলিসের মধ্যে বাচ্চা দস্তরখানায় উঠে বিভিন্ন জিনিস উঠাবার চেষ্টা করছে এবং খাওয়া-দাওয়ার আসবাবপত্র ছুঁড়ে ফেলছে, আর তখন পিতা -মাতা মনে মনে খুশি হয়ে বলছেন,

দেখ আমার ছেলে কত নির্ভিক, বাড়িতে খাওয়ার কাছে যেতে রাজি হয় না, আর এখানে মাশা'আল্লাহ তৃপ্ত হয়ে খাচ্ছে।

আর বাড়িতে যাওয়ার পর তার উপর রাগান্বিত হবেন, সুন্দর ও বিনম্র ভাষায় তাকে বুঝাবেন, বাবা দাওয়াতে যেসব জিনিস খেয়েছ তা কী তোমার বাড়িতে নেই? খাবার খাওয়ার সময় জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলা কত খরাপ কথা! এ ধরনের কাজতো এমন বাচ্চারা করে যারা এসব খাবার চোখেই দেখেনি।

বাবা, আল্লাহ তা'আলার কত বড় অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে পানাহার ও ব্যবহারের জন্য বহু নেয়ামত দান করেছেন। এরপর যদি এমন আচরণ করো, তাহলে আল্লাহ পাকের নাশোকরী হবে। আর যদি কখনও আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন তাহলে আমাদেরকে যেসব নেয়ামত দান করেছেন তা ছিনিয়ে নিবেন। তাই ভবিষ্যতে এ ধরনের আচরণ আর কখনো করবে না।

এভাবে অনেক সময় বাচ্চা হয়ত রাত্রি বেলা ঘুমাচ্ছে না কোনো কিছুর জন্য রাগ করে আছে, তখন মা বাচ্চাকে আদর করার পরিবর্তে ধমকাতে ও মারধর করতে শুরু করে, কিংবা বলে, হতভাগা! ঘুমাচ্ছ না কেন? সারাদিন কষ্ট দিয়েছে, এখন রাতেও একটু আরাম করতে দিচ্ছো না। পোড়া কপাল। আমার ঘরে কেন সন্তান জন্ম নিয়েছে ইত্যাদি বলা। অথচ ওই সময় উচিত ছিল বাচ্চা কোনো গল্প শোনার জেদ করলে তাকে কোনো সাহাবীর গল্প শোনানো। আর যদি তার ক্ষুধা লেগে থাকে, তাহলে কিছু খেতে দেয়া, আদরের সাথে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দু'আ করা ইত্যাদি। মোটকথা, বাচ্চাদেরকে শাসনের সময় সোহাগ করা এবং সোহাগের সময় শাসন করা তাদের নষ্ট হওয়ার বড় কারণ।

অরুচিকর স্টাইল ও ফ্যাশন পরিহার করুন:

বর্তমান সময়ে অরুচিকর ফ্যাশন ও স্টাইলের অন্ধ অনুসরণ খুবই সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের উন্মাদনার পেছনের কারণ কী?

আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বমূল্যবোধ প্রত্যেক মানুষের সমৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম, যা জীবনকে উপভোগ্য করে তোলে। অনেকে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ফুটো করে, ট্যাটু ব্যবহার করে কিংবা অদ্ভুত চুলের স্টাইলের মাধ্যমে অন্যের সামনে নিজেকে জাহির করতে চায়। এই সমস্ত চলাফেরার মাধ্যমে তারা চায় বিপরীত লিঙ্গকেও আকৃষ্ট করতে। অনেকে এগুলোর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ, আত্মপরিচয় অর্জন কিংবা সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়।

বিশ্বাসীদের আত্মসম্মানবোধ, পরিচয়বোধ ও জীবনের অর্থ নির্ধারিত হয় তাদের বিশ্বাস, আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি করে। ইসলামে পোশাক, নৈতিকতা ও আচার-আচরণের নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে-যা মুসলিমদের জীবনকে করে সৌন্দর্যমণ্ডিত। এ সকল বিধান পালনের মাধ্যমে একজন মুসলিম সন্তোষজনক উপায়ে মর্যাদা ও আভিজাত্যের সাথে নিজের জীবন পরিচালনা করতে পারে।

তরুণ-তরুণীরা সাধারণত বুঝতে পারে না, অরুচিকর ফ্যাশনের অনুকরণে পোশাক পরিধান এবং এর মাধ্যমে বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্টি করার আত্মতুষ্টি খুবই ক্ষণস্থায়ী। এর ফলে শালীনতা ও আত্মমর্যাদার বিপর্যয় ঘটে। আর এতে অতিমাত্রায় অর্থ উপার্জনকারী ফ্যাশন ইন্ড্রাস্ট্রিগুলোর কোনো যায়-আসে না। মুসলিম অভিভাবকগণকে এই ব্যাপারে অবশ্যই সচেতন হতে হবে।

সন্তানের প্রশ্নে রেগে উঠবেন না:

শিশুদের কৌতূহল খুব বেশি। সে জানতে চায়। এ কারণে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে। কারণ তার চারপাশের অনেক কিছুই তার কাছে অপরিচিত। তার এ কৌতূহল ও প্রশ্ন করার আগ্রহটা প্রকৃতপক্ষে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বেঁচে থাকার পরিচায়ক। এ ক্ষেত্রে একজন অভিভাবকের অবশ্য কর্তব্য হলো, এটাকে একটা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে তাকে পর্যাপ্ত তথ্য সম্পর্কে জ্ঞাত করে তোলা। তবে অধিক প্রশ্ন করার কারণে তাকে মন্দ বলা বা কোনো প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করা যাবে না। বরং প্রতিটি প্রশ্নের স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত ও তথ্যসমৃদ্ধ উত্তর প্রদান করা প্রতিটি অভিভাবকের দায়িত্ব । এতে একদিকে যেমন তার ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে বিশুদ্ধ অর্থবোধক বাক্য গঠনেও সক্ষম হয়ে উঠবে। সেহেতু একজন অভিভাবকের যথাসাধ্য সঠিক উত্তরদানে সচেষ্ট হওয়া উচিত। শিশুর প্রশ্নের যেনতেন উত্তর দিয়ে দায়সারা একটা ভাব দেখানো মোটেই ঠিক কাজ নয়।

সন্তানকে তিরস্কার না করা:

মনে রাখবেন মা-বাবা হবার জিম্মাদারি এক বড় জিম্মাদারি। এ জিম্মাদারি গ্রহণ করলে আপনাদেরকে যথেষ্ট ধৈর্য ও সহ্যের পরিচয় দিতে হবে। মাঝে-মধ্যে সন্তানের অযথা কাজ-কর্ম দেখে আপনার হয়ত ভীষণ রাগ হবে, তার হরেক রকম দুষ্টমী, ব্রেনের দুর্বলতা অথবা রাতভর ছোট বাচ্চার ঘুমাতে না দেয়া, সকাল বেলা বড় ছেলের স্কুলে না যাওয়া, তৃতীয় ছেলের চায়ের কাপ ভেঙে ফেলা এমতাবস্থায় তারাই সার্থক পিতা -মাতা হবেন যদি এ সকল ঝামেলাকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার রাজি-খুশির জন্য সহ্য করেন, কচি শিশুকে মারপিট না করে বরং

তার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে সেজদাবনত অবস্থায় এ দু'আ করেন, 'হে আল্লাহ, আমি দুর্বল, আপনি আপনার স্বীয় অনুগ্রহ এবং রহম ও করমে আমাদেরকে বাচ্চার মাতা-পিতা বানিয়েছেন। আমরা বাচ্চার পরিপূর্ণ সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানে অক্ষম। আপনিই সাহয্য করুন, পথ দেখান, বাচ্চাকে আমাদের অনুগত বানিয়ে দিন এবং আমাদের চক্ষুর শীতলতা বানান। এভাবে আমল করতে থাকলে অল্প দিনের মধ্যেই ইনশাআল্লাহ তা'আলা দেখতে পাবেন, বাচ্চা আপনাদের চক্ষুর তারকা এবং হৃদয়ের শীতলতার কারণ হবে। তবে এজন্য মোজাহেদা এবং ধৈর্য তো অবশ্যই লাগবে।

একজন পিতা-মাতা হিসেবে বুযুর্গদের এ বাণীটি অবশ্যই স্মরণ রাখবেন, মেহেদী যতই পেষণ করা হয়, ততই রং দেয়। একদা সুরমা, পেষণকারীদের বললো, আমাকে কেন এমন পেষণ কর? পেষণকারী জবাব দিল, পেষণ করার পর যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে তখন তোমার স্থান হবে সৃষ্টির সেরা প্রাণীর শ্রেষ্ঠ অঙ্গে অর্থাৎ মানুষের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অঙ্গ চক্ষুতে। আসল কথা হলো চেষ্টা-সাধনা করলে সবকিছুই মিলে যায়। কিছুদিন কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে থাকুন, ইনশাআল্লাহ তা'আলার প্রতিদান মিলবেই।

পরিবারে অনেক পিতা-মাতার আচরণ আপত্তিজনক। তারা একের অপরাধের কারণে অপর সন্তানদেরও ধমকায়, অথবা অপরাধকারীকে অন্য ভাই-বোনদের সামনে অপদস্ত ও অপমানিত করেন, এ দু'টিই ভুল। পিতা-মাতার উচিত কখনও তাকে অন্য ভাই-বোনদের সামনে লজ্জিত না করা এবং একজনের অপরাধে বাড়ির অন্য সকলের উপর রাগ ঝেড়ে অশান্তি সৃষ্টি না করা। অনুরূপ সাহস ও যোগ্যতা খর্বকারী শব্দ অথবা এমন কোনো কর্মপদ্ধতি অবলম্বন না করা যার ফলে বাচ্চার অনুভূতিতে আঘাত লাগে। যেমন এরূপ বলা, 'অমুক ছেলে কতো এগিয়ে গেছে, এরূপতো কিছুই করতে পারলে না। অন্যের শেকায়েত করা, খেলাধুলা, ঝগড়া-মারামারি, খানাপিনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে খুবই অগ্রসর, অথচ পরীক্ষায় এত কম নাম্বার পেলে যে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাচ্চাদের সাথে এরূপ আচরণকারী পিতা-মাতা, উস্তাদ অথবা বড় ভাই-বোনদের হয়ত ধারণা, এরূপ ধমক দিলে ও বিদ্রূপ করলে বাচ্চার উপর ভাল প্রভাব পড়বে এবং তারা শুধরিয়ে যাবে। কিন্তু এটা তাদের নিছক ভুল ধারণা। কারণ, এরূপ আচরণে বাচ্চাদের ব্যক্তিত্বের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে, তারা আবেগ প্রবণ ও অসাবধানী হয়ে যায়। তাদের মধ্যে অযোগ্যতা, অভদ্রতা নানাভাবে স্পষ্ট হতে থাকে। তারা নির্জনতা পছন্দ করে, তাদের মধ্যে খিটখিটে স্বভাব সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ বাচ্চাদের বলতে শোনা গেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ আমিই খারাপ, আল্লাহ করুক আমি যেন মরে যাই, আমাকে মেরে ফেল না কেন?

সুতরাং মুসলমান পিতা-মাতার প্রতি আবেদন, এ বিপদসংকুল ও সূক্ষ্ম দিকটির প্রতি সর্বাধিক খেয়াল রেখে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করুন। বাচ্চার প্রতি আপনার সামান্য মনোযোগ, ধৈর্য, সহ্য, একটু নরম ব্যবহার, চিন্তা ফিকির ও দু'আ ইনশাআল্লাহ সুফল বয়ে আনতে পারে। অপরদিকে আপনার একটু অমনোযোগিতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও অবহেলা বাচ্চাকে সারাজীবনের জন্য বরবাদ করে দিতে পারে। অনুরূপভাবে বাচ্চারা কোনো দোষ-ত্রুটি করলেই তাদেরকে না বুঝিয়ে, প্রথমবারেই জোর গলায় বললেন, খবরদার! আগামীতে কখনো এরূপ করবে না। আর যদি কখনো ফ্রিজ থেকে কিছু বের করে খাও তবে কিন্তু ভাল হবে না। আর যদি কখনো কারপেটের উপর প্রস্রাব করো, তাহলে মার দিবো, এ ধরনের কথায় কখনো সুফল বয়ে আনেনা।

কোনো পিতা-মাতা যদি উপরোক্ত বাক্য ব্যবহার না করে ঠাণ্ডা মাথা ভেবে-চিন্তে রাগ থেমে যাওয়ার পর বাচ্চাকে নিজের কাছে ডেকে স্নেহ ও মহব্বতের সঙ্গে বুঝিয়ে তার মন-মস্তিষ্কে ঐ খারাপ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা হয় তাহলে সে মানসিকভাবে ঐ খারাপ কাজগুলো ছেড়ে দিতে মনস্থির করে এবং স্বেচ্ছায় ছেড়েও দেয়।

কিছু শেখানোর ক্ষেত্রে কঠোরতা পরিহার করুন:

সন্তানের উচ্চ স্থান অর্জনের আগ্রহ কখনও কখনও অভিভাবককে তার করণীয় পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়ে থাকে। ফলে তা সন্তানের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে যায়। এমনকি সন্তান এতে বেশ বিরক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের ধারণ ক্ষমতার দিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখলে প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালন ফলপ্রসূ হতে পারে। আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমবয়স্ক একদল যুবক আসল। তারা তাঁর নিকট বিশ দিন অবস্থান করল। অতঃপর যখন তিনি অনুধাবন করলেন যে, তাদের নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার বিষয়টা তাদের নিকট একটু কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের অন্তিম উপদেশ দিলেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের নিকট মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রা:)হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর নিকট আগমন করলাম, তখন আমরা সবাই টগবগে যুবক ছিলাম। আমরা তাঁর নিকট বিশ দিন বিশ রাত অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা:) ছিলেন কোমলহৃদয় ও বিনম্র প্রকৃতির মানুষ। এরপর যখন তিনি বুঝতে পারলেন, আমরা নিজেদের পরিবারের প্রতি আর্কষণ অনুভব করছি এবং আমাদের কষ্ট হচ্ছে। আমরা যাদের পেছনে রেখে এসেছি তাদের সম্পর্কে আমাদেরকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন- 'তেমারা তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে অবস্থান করো। তাদের শিক্ষা দাও। তাদের আদেশ করো।' আরো কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন যা আমি মনে রাখতে পেরেছি অথবা আমার মনে নেই। 'তোমরা সালাত আদায় করো যেভাবে তোমরা

আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছ। অতএব যখন নামাযের সময় উপস্থিত হবে তখন তোমাদের মধ্যে একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞজন নামাযে তোমাদের ইমামতি করবে।

সহিহ বুখারি,কিতাবুস সালাত

রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন তাদের পরিবারের দিকে আগ্রহ লক্ষ্য করলেন

তখন তাদের সেদিকে ফিরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেক মূল্যবান উপদেশ দিলেন। এ হাদিস থেকে এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সন্তানকে কোনো বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে তার সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া ও তার প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হওয়া, তাদের প্রতি বিনম্র হওয়া ও মানবিক দুর্বলতাকে অবজ্ঞা না করা অভিভাবকবৃন্দের একান্ত কর্তব্য। সুতরাং তাদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করবেন না যাতে তাদের কষ্ট হয়। তারা ফেরেশ্তা নয়, বরং তারাও আর পাঁচটা মানুষের মতোই সাধারন মানুষ।

মিথ্যা ওয়াদা না দেওয়া:

অনেক পিতা-মাতা এমন আছেন যারা জেনে-বুঝেই সন্তানদেরকে মিথ্যা ওয়াদা দিয়ে থাকেন। কেউ সুন্দর ঘড়ি এনে দেয়ার ওয়াদা করেন। কখনও বা সুন্দর সুন্দর খেলনা ও মিঠাই কিনে দেয়ার ওয়াদা করে থকেন। কিন্তু এসব ওয়াদার একটিও পূরণ করা হয় না। শুধু ধোঁকা দেয়ার এবং ভুলিয়ে রাখার জন্য এসব ওয়াদা করা হয়। তাদের মূলত উদ্দেশ্য থাকে অল্প সময়ের জন্য সন্তানকে খুশি রাখা। তবে এরূপ মিথ্যা ওয়াদাকারী পিতা- মাতার স্মরণ রাখা দরকার, এভাবে তিনি তার সন্তানকে মিথ্যা বলার এবং ওয়াদা ভঙ্গ করার শিক্ষা দিচ্ছেন। আর এ শিক্ষাই তার চরিত্র ও ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে থাকে। কাজেই এ ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত।

অভিশাপ না দেওয়া:

মা-বাবা কর্তৃক সন্তানের জন্য সামগ্রিক কল্যাণের দোয়া করা যা নবী-রাসুলগণের যুগে ঈমানদারদের সুন্নত ছিল।

ইবরাহীম (আ:) বলতেন

বলতেন-বিনি

وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ

হে আমার প্রকিপালক, আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্যে হতেও।

সূরা ইবরাহিম:৪০

যাকারিয়া (আ:)বলতেন-

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

সে বলল, হে আমর রব, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।
সূরা আলে ইমরান :৩৮

একজন ঈমানদারের প্রার্থনা-

وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي

আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎ বংশধর দান কর।
সূরা আহক্কাফ:১৫

ঈমানদারগণের প্রর্থনা-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর।
সূরা আল ফুরক্কান:৭৪

সন্তানদের সৌভাগ্যের অন্যতম সোপান মা-বাবার দোয়া। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী- 'তিনটি দোয়া আল্লাহর নিকট নিশ্চিত কবুল যোগ্য।' সেখানে রাসূলুল্লাহ সন্তানের জন্য বাবার দোয়াকেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অনেক মানুষ এ দোয়াকে সন্তানের উপকারের জন্য ব্যবহার করার পরিবর্তে তারা বিষয়টাকে সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়ে দিতে অভ্যস্ত। যখন তারা ওদের ওপর রাগান্বিত হয় অথবা সন্তানরা এমন কাণ্ড ঘটিয়ে বসে যা তাদের অসন্তুষ্টির কারণ হয়, তখন তারা ওদেরকে অভিশাপ দেয়, বদ-দোয়া করে বলে থাকে-'আল্লাহ, ওকে ধ্বংস করে ফেল, ওকে শাস্তি দাও অথবা ওর ওপর অভিসম্পাত কর! কেন মৃত্যু তোকে চোখে দেখে না। কত মানুষকে আল্লাহ নিয়ে নেয়, তোকে নিতে পারে না? এগুলো বলার স্থলে তারা বলতে পারেন: হে আল্লাহ, ওকে হেদায়েত দাও, ওকে সংশোধন করে দাও, ওকে পরিপাটি করে দাও এবং ওর তাওবা কবুল কর ইত্যাদি। কারণ এটা হলো উত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট

পদ্ধতি। এর মধ্যে কারো জন্য কোনো ক্ষতি নেই, বরং এতে সন্তান ও পিতা- মাতা উভয়ের জন্য কেবল কল্যাণ আর কল্যাণই নিহিত রয়েছে।
যদি তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়, তাহলে সে হবে নিতান্ত লজ্জিত। রাসুলুল্লাহ (সা:) সন্তানদের অভিশাপ দিতে নিষেধ করেছেন। কারণ এর মধ্যে এমন বিপদ নিহিত যেখানে কোনো ধরনের উপকারিতা নেই। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন- 'তোমরা তোমাদের নিজেদের, তোমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সম্পদের ওপর অভিশম্পাত করো না। তোমরা ঐ সময়ের ব্যাপারে আল্লাহর সঙ্গে ঐকমত্যে যেও না যখন আল্লাহর নিকট কোনো দান প্রার্থনা করলে তিনি তা তোমাদের জন্য কবুল করে থাকেন।

অপরাধ প্রশ্রয় না দেওয়া:

একদিকে যেমন এমন অভিভাবক রয়েছেন যারা সামান্য অপরাধে কঠিন শাস্তি দিয়ে থাকেন। অপরদিকে বড় বড় অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি দানকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন এমন অভিভাবকের সংখ্যাও একেবারে কম নয়, অথচ উভয় কাজই নিন্দনীয়। তরুণ-তরুণীদের থেকে কোনো ত্রুটি সংঘটিত হয়ে গেলে তা হালকা করে দেখা অথবা এক্ষেত্রে এমন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করা যে, 'এ বয়সে এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার'- উচিত নয়। যদি সে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে ওখান থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধানরত অবস্থায় তাওবা করে ফিরে আসে তবুও। কারণ, এ অবস্থায় তাকে যদি কোনো ভর্ৎসনা, তিরস্কার ও লজ্জা দেয়া না হয় 'সে অপরাধ স্বীকার করে তাওবা করে ফিরে এসেছে' শুধু এ কারণে, তাহলে সে বিষয়টিকে হাল্কা মনে করে তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। ঐ লোকটির দিকে লক্ষ্য করুন, যে পবিত্র রমযান মাসে স্ত্রী সম্ভোগ করে রাসূলুল্লাহ শালাকার-এর নিকট ফতওয়া জিজ্ঞেস করার জন্য এসেছে। রাসূলুল্লাহ এর সহধর্মিণী উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়ায় বলেন-'পবিত্র রমাদান মাসে রাসুলল্লাহ আপাহার-এর সাক্ষাতে এক লোক মসজিদে নববীতে এসে বলে-রা আল্লাহর রাসূল, আমি দগ্ধ হয়ে গেছি, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহই তাকে প্রশ্ন করলেন- 'তোমার কি হয়েছে? উত্তরে সে বললো 'আমি স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করে ফেলেছি।' তিনি শিল বললেন-'সাদকা কর।' এরপর সে বললো- 'হে আল্লাহর নবী। আমার তো কোন সম্পদ নেই। সুতরাং আমি সাদকা করতে সক্ষম নই।' তিনি বললেন- 'তুমি বসো!' তখন লোকটি বসে রইল। ইতিমধ্যে খাদ্য সামগ্রী বোঝাই গাধা হাঁকিয়ে এক ব্যক্তি আগমন করলো। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- 'একটু আগে যে দগ্ধ লোকটি এসেছিলো সে কোথায়?' তখন লোকটি দাঁড়িয়ে গেলে পরে রাসূলুল্লাহ বললেন- 'যাও এটা নিয়ে সাদকা কর গিয়ে।' অতঃপর সে বললো, 'আমাদের ছাড়া অন্য কাউকে?' আল্লাহর শপথ! আমরা ক্ষুধার্ত ও কপর্দকশূন্য।' এরপর তিনি বললেন- 'তাহলে তোমরাই তা আহার

করো! ভদ্রলোক তার অপরাধ স্বীকার ও তাওবা করে সমাধান জানার জন্য এসেছে। এর প্রমাণ তার কথা 'আমি দগ্ধ হয়ে গেছি, আমি পুড়ে গেছি' যার অর্থ তার কৃত অপরাধ বোধ ও তার অবগতি। যদিও রাসূলুল্লাহ তার তাওবার দিকে তাকিয়ে তাকে কোনো শাস্তি দেননি। আর তা ছাড়া তার কর্মটি দণ্ডবিধির আওতায় পড়ে এমন অপরাধও নয়। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ তার অপরাধটিকে খাটো করে না দেখে বললেন- 'একটু আগে যে দগ্ধ লোকটি এসেছিলো সে কোথায়? যা থেকে প্রতিভাত হয় যে, তার সে অপরাধকে তুচ্ছ জ্ঞান করা যাবে না। অনন্তর পাপের বৈশিষ্ট্য হলো তা আগুনের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় যা মানুষকে ভস্মীভূত করে দেয়।

তরুণ ও তরুণীদের থেকে অপরাধ সংঘটিত হলে তা তুচ্ছ করে না দেখার অর্থ এ নয় যে, অভিভাবক তাকে অব্যাহতভাবে লজ্জা দিতেই থাকবে। যখন সে আলোচনা করবে, কোন কথা অথবা কোন কাজ করবে তখনই তাকে বলা হবে: তুমি হলে এই, এই। কারণ, এ পদ্ধতি সংশোধন নয়, তাকে কেবল ধ্বংস করতে পারবে। সুনানে আবু দাউদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- বর্তমানকালে কারো পূর্ব সংঘটিত অপরাধের জন্য তিরস্কার ও দোষারোপ করা, চাই তার তাওবা জ্ঞাত হোক বা অজ্ঞাত। তবে অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার সময় বা তার পরক্ষণে লজ্জা দেয়ার যার সামর্থ্য আছে তার ওপর এটা কর্তব্য। আবার কখনও বা দণ্ডবিধি অথবা শাস্তি বিধান করা আবশ্যক হয়ে যায়। এসব সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের পর্যায়ভুক্ত।

সবার সামনে অপমানিত না করা:

আমরা অনেক সময় সন্তানের দোষত্রুটি নিয়ে পরিবারের সবার সামনে, আত্মীয়স্বজনদের সামনে তাদের সাথে চিৎকার চেচামেচি করি যেটা একেবারেই বাজে একটা বিষয়।

বাচ্চাদের আত্মসম্মান খুব উচু স্থরের হয়ে থাকে, আপনি হয়তো সবার সামনে কোনো বিষয় নিয়ে তাকে খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলেন,অথবা হতে পারে আপনি মজার ছলে বলেছেন

কিন্তু সেটা যে আপনার সন্তানের উপর কতটা বাজে প্রভাব ফেলবে আপনি টেরও পাবেন না। আপনার সন্তান আপনাকে শত্রু ভাবতে শুরু করবে সে ভাববে আপনি তার ভালো চান না সেজন্য সবার সামনে তাকে ছোটো করছেন।

পারিবারিক মেলবন্ধন

'একবার রাসূল (সা:)হাসান ইবনে আলি (রা:)-কে চুম্বন করলেন। সে সময় আল আকরা ইবনে হারিস আত-তামিমি (রা:) তাঁর পাশে বসা ছিলেন। আল আকরা (রা:)বললেন-"আমার দশটি সন্তান রয়েছে। তাদের কাউকে আমি কখনো চুম্বন করিনি।" রাসূল তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন-

“যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না”

আল আদাবুল মুফরাদ, বুখারি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় মাধ্যমিকের কিশোররা বিদ্যালয় ও পরিবারের বাইরে বেশি সময় ব্যয় করে। তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের থেকে বেশি স্বাধীনতা পায় এবং চারদিকের দুনিয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে শুরু করে। বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন, শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধব, টিভি প্রোগ্রাম, ইন্টারনেট ও বহির্বিশ্বের দ্বারা তাদের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন হয়, যা তাদের কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। এর পাশাপাশি পারিবারিক পরিবেশ, পিতা-মাতা, বর্ধিত পরিবার এবং সমাজে বিভিন্ন মানুষের আচার-আচরণের দ্বারাও তরুণদের চালচলন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

যে সমাজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা হয় না এবং যেখানে সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় সম্পত্তি ও পদ-পদবির ওপর নির্ভর করে, সে সমাজে পারিবারিক পরিবেশই কিশোরদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার একমাত্র উপায়। একজন মানুষের মর্যাদা তার তাকওয়া ও চারিত্রিক মাধুর্যতার ওপর নির্ভর করে-এই বিষয়টি কিশোর মন-মগজে ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করাতে হবে।

পিতা-মাতার উচিত সন্তানের পেছনে সার্থক সময় ব্যয় এবং তার সুস্থ মনন গঠনে সহায়তা করা। এই ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে অনুকরণীয় চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, যাতে কিশোররা সেলিব্রেটিদের পরিবর্তে নিজ পরিবারেই অনুসরণীয় আদর্শ খুঁজে পায়।

এর পাশাপাশি সন্তানদের বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির প্রতিও পিতা-মাতার খেয়াল রাখতে হবে। সন্তানদের সমস্যা একেকজনের ক্ষেত্রে একেক ধরনের হতে পারে। এই সকল সমস্যার নির্দিষ্ট ও একক কোনো সমাধান নেই। তাই অভিভাবকদের সৃষ্টিশীল ও অগ্রণী চিন্তার অধিকারী হতে হবে, যাতে তারা সন্তানদের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করতে এবং চারপাশের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি থেকে ফিরিয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।

সমাজ দোষী আমরা নির্দোষ?

আমরা বলি যামানা বদলে গেছে, আজকালকার বাচ্চারা এমনই হয়,একদমই কথা শুনতে চায় না,আমরা এমন ছিলাম না,এতো দুষ্টমি কিভাবে করে এরা, উহ্হ্ এরা এতো জালায় আর সহ্য করা যায় না। কিন্তু আমরা মানুষেরাও বদলে গেছি, বদলে গেছে আমাদের চিন্তা-চেতনাও সেটা কি কখনো ভেবে দেখেছি? নিজেরাই নানান রকম সমস্যা সৃষ্টি করছি। তারপর দিনশেষে সমাধান খুঁজি হন্যে হয়ে। কিন্তু খুঁজে পাইনা কোনো সমাধান। আমাদের দোষের কারনে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এসে পড়ে যায় অকূল পাথারে। তারা নিজেরাই হয়ে দাঁড়ায় একেকটা সমস্যা।আবার আমরা এধারণাও করে বসে থাকি 'আগের মতোই বাচ্চা হবে আর হুট করে সব রীতি-নীতি

মেনে বড় হয়ে যাবে, সমাজ থেকে শিখে নিবে সব নৈতিকতার শিক্ষা।' অথচ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন নানান রকম সমস্যা।তাই সমাজকে দোষারোপ না করে নিজদের শোধরাতে হবে,মনে রাখতে হবে আমি আপনি আমরা মিলেই কিন্তু সমাজ তৈরি হয়।তাই আমরা ঠিক হলেই সমাজ হবে সুন্দর সুশৃঙ্খল,গড়ে উঠবে এক সভ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

সন্তানের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন

সন্তানদের একাডেমিক ইসলামী শিক্ষা

অনেকেরই ধারণা যে, বাসায় একজন হুজুর রেখে দিলে বা সন্তানকে বিকেলে বা সকালে হুজুরের কাছে কায়দা বা কুরআন পড়তে পাঠালেই সব হয়ে গেল, সে ইসলাম শিখে ফেলবে এবং পাক্কা মুসুল্লি হয়ে যাবে। এ ধারণা ভুল। সাধারণত ওখানে কুরআন তিলাওয়াত অর্থাৎ শুদ্ধ করে কুরআন রিডিং পড়তে শিখানো হয় মাত্র। ইসলামিক স্টাডিজ পড়ানো হয় না। তবে কোন কোন জায়গায় কুরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি কিছু মাসলা-মাসায়েল, দু'আ হয়তো শেখানো হয়।

তাই আমাদের সন্তানদেরকে প্রকৃত মুসলিম বানানোর জন্য তার সাধারণ এডুকেশনের পাশাপাশি real life oriented "Islamic Science & Islamic Studies" পড়াতে হবে, যেখানে তার জীবন পরিচালনার জন্য থাকবে সমস্ত শিক্ষা। সন্তানদেরক প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে আমাদের নিজেদেরই নিজ ঘরে উদ্দ্যোগ নিতে হবে।দিতে হবে বিষয়ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা।যেমন;

১. সম্পূর্ণ কুরআনের অর্থ
২. সিলেক্টেড সূরার তাফসীর
৩. সংকলিত হাদীস
৪. হাদীস সংকলনের ইতিহাস
৫. ঈমান ও আকীদা
৬. তাওহীদ ও শিরক
৭. সুন্নাত ও বিদ'আত
৮. রসূল-এর নামায (সলাত) শিক্ষা
৯. রসূল-এর জীবনী
১০. সাহাবীদের জীবনী
১১. অন্যান্য নাবীদের জীবনী

১২. ইসলামের দাওয়াত
১৩. ইকামাতুদ দ্বীন (দ্বীন প্রতিষ্ঠা)
১৪. ইসলামের ইতিহাস

সন্তানের পড়ালেখায় পিতা মাতার সহায়তা

দোয়া করা:

সন্তানের জন্য সব সময় দু'আ করতে হবে।অনেক বাবা-মায়েরাই সন্তানের জন্য নিমমিত দু'আ করেন না। সন্তান যেন সব বিষয়েই ভাল করে সেজন্য প্রতি ওয়াক্তের সলাতের শেষে দু'আ করা উচিত।

ভাল স্কুল/কলেজ নির্বাচন:

এই বিষয়টি আমাদের দেশে বলার অপেক্ষা রাখে না। সকল বাবা-মায়েরাই চান তার সন্তান একটি ভাল স্কুলে বা কলেজে পড়বে। তবে যে সকল স্কুল বা কলেজ কর্তৃপক্ষ সেকুলার বা ইসলাম বিদ্বেষী সেই সকল প্রতিষ্ঠান যতো ভালই হোক না কেন সেগুলোতে সন্তানদেরকে ভর্তি না করালেই ভাল। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরে।

পড়ালেখায় মনোযোগ নষ্ট করতে পারে তা থেকে সতর্কতা:

ঘরে যদি এমন কিছু থাকে যার কারণে সন্তানদের পড়ালেখায় ক্ষতি হতে পারে তা সরিয়ে নেয়া উচিত। অনেক সময় টেলিভিশন সন্তানদের পড়ালেখার প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। বাসার বড়রা কেউ হয়তো ড্রইংরুমে বসে টিভিতে নাটক দেখছে তখন ছেলেমেয়েদের পড়ায় মন বসে না, তাদেরও নাটক দেখতে ইচ্ছে করে, তদের মন পড়ে থাকে টিভির মধ্যে।

পারিবারিক রুটিন থাকা উচিত: আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সাধারণত প্রতিদিন সন্ধ্যার পর পড়তে বসে। কিন্তু সেই সময় যদি প্রায়ই বাসায় মেহমান আসে বা বাবা-মায়ের বন্ধু-বান্ধব আসে তাহলেও ছেলেমেয়েদের পড়ালেখায় ক্ষতি হয়। পারিবারিক রুটিন এমন হওয়া উচিত যেন তারা পড়তে বসে বাধার সম্মুখিন না হয়। পরিচিতরাও যেন পারিবারিক রুটিন সম্পের্কে অবগত থাকে।

ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে দেয়া:

আমি যেনো আমার সন্তানদের ভালভাল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেই, পরিচয় করিয়ে দেই, পরিবারিকভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে দেই। এতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাল করার উৎসাহ বাড়বে।

অর্থ খরচ করার মানসিকতা: আর্থিক সমস্যা না থাকার পরও কোন কোন

বাবা-মা সন্তানদের প্রয়োজনীয় খাতা, বই, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি স্টেশনারী কিনে দিতে চান না। গাফিলতি করে সন্তানদের স্কুল-কলেজের বেতন দেরী

করে দেন, প্রাইভেট শিক্ষক বা কোচিংয়ের বেতন ঠিক মতো দিতে চান না। এই ধরনের মনমানসিকতাও পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

স্পেশাল কেয়ার (তত্ত্বাবধান):

যে সন্তানটি কম মেধা সম্পন্ন বা একটু

দেরীতে বুঝে বা একটু কম বুঝে, তাদের পিছনে অতিরিক্ত সময় দেয়া উচিত। তাকে অবহেলা করা ঠিক না বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা একেবারেই ঠিক না। তাকে প্রচুর পরিমানে উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

স্বাস্থ্যগত সমস্যায় করণীয়:

কোন কোন ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যগতভাবে দুর্বল,প্রায়ই অসুস্থ থাকে। তাদের দিকেও স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে। তার স্বাস্থ্যগত দুর্বলতার কারণে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। তাকে ডাক্তার দেখিয়ে পুরোপুরি সুস্থ করে তুলতে হবে।

স্টাডি টুরের ব্যবস্থা করা:

অনেক স্কুল-কলেজে স্টাডি টুরের ব্যবস্থা থাকে।সন্তানদের স্টাডি টুরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া যেতে পারে। স্টাডি টুরের মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটে। তবে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে স্টাডি টুরে গিয়ে ছেলেমেয়েরা অবাধ মেলামেশায় সুযোগ না পায়।

স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা: ছাত্র-ছাত্রীরা স্কলারশিপ পেলে পড়ালেখায় আরো উৎসাহ পায়। তাই তাদের স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য উৎসাহ দেয়া উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কলারশিপ ছাড়াও আরো অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ দিয়ে থাকে, খোঁজ-খবর নিয়ে সেগুলোর ব্যবস্থা করে দেয়া যেতে পারে।

অতিরিক্ত বোঝা না চাপানো:
বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে পড়ালেখার পাশাপাশি পরিবারের আরো অনেক কাজ করতে হয়। যেমন ঘরের কাজ, বাজার করা, বিল দেয়া, বাবার ব্যবসা দেখা ইত্যাদি। এই কাজগুলো করা ভাল তবে খেয়াল রাখতে হবে যে এই কাজগুলোর যেন একটা সীমা থাকে। তাদের ঘারে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়া যাবে না এতে পড়ালেখার ক্ষতি হতে পারে।

পরীক্ষায় খারাপ করলে করণীয়: সন্তান পরীক্ষায় খারাপ করলে তার জন্য চেচামেচি করে বাসা মাথায় করা যাবে না। তার সাথে দূর্ব্যবহার করা যাবে না। তার সাথে সময় নিয়ে বসতে হবে, বুঝতে হবে কেন সে পরীক্ষায় খারাপ করেছে, তার প্রকৃত কারণগুলো খুঁজে বের করে তার সমাধানের দিকে যেতে হবে। তাকে আরো উৎসাহ দিয়ে তার পেছনে বাবা-মাকে আরো অতিরিক্ত সময় দিয়ে তার দুর্বলতাগুলো দূর করতে হবে।

পরিমিত ঘুম প্রয়োজন:
অনেক ছেলেমেয়েরাই রাতে দেরীতে ঘুমোতে যায়, এটি মোটেও ঠিক না। সেদিকে বাবা-মাকে খেয়াল রাখতে হবে। ছেলেমেয়েরা যেন বেশী রাত না করে। ঘুম পরিমিত না হলে সকালে উঠতে কষ্ট হয়, ফজর সলাত মিস হতে পারে এছাড়া সারা দিন ক্লাসেও মন বসবে না।

সন্তানের পড়ার স্থান যেমন হবে: পড়ার স্থানে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো-বাতাস থাকে, জানালা থাকলে খুবই ভাল। পড়ার জন্য রিডিং টেবিল এবং হাইট অনুযায়ী চেয়ারও প্রয়োজন। এতে তার পড়ালেখায় মনোযোগ আসবে। অনেক মা-বাবা আছেন বৈদ্যুতিক বিল কমাবার জন্য বাসায় সব সময় স্বল্প আলোর ব্যবস্থা করে থাকেন। পরামর্শ থাকবে যে, যদি সামর্থ থাকে অন্তত সন্তানদের পড়ালেখার সময় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্তা করা।

দারিদ্রতা দূর করা:
দারিদ্রতার কারণে অনেক ছেলেমেয়েরা ঠিক মতো পড়ালেখায় মন বসাতে পারে না। সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তা করে দারিদ্রতামুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। দারিদ্রতা থেকে মুক্তির জন্য সবসময় মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করতে হবে।

পারিবারিক দাওয়াত:

পারিবারিক দাওয়াত প্রায় সকল পরিবারেই রয়েছে,বিশেষ করে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে। অতিরিক্ত পারিবারিক দাওয়াত ছেলেমেয়েদের পড়ালেখায় ক্ষতি করে। তাই বলে কোনো দাওয়াতেই না যাওয়া উচিতও নয়। এমনিতেই আজকালকার সন্তানরা অনেকটা অসামাজিক হয়ে যাচ্ছে অনলাইন যোগাযোগে অভ্যস্ত হবার কারণে। এই দাওয়াত খাওয়া এবং দাওয়াত দেয়া দুটোই কন্ট্রোল করা উচিত। যখন তখন ছেলেমেয়েদেরকে বাসায় রেখে দাওয়াতে চলে যাওয়া ঠিক না আবার তাদেরকে হঠাৎ করে পড়া বাদ দিয়ে সাথে নিয়ে যাওয়াও ঠিক না। দাওয়াতের বিষয়ে সন্তানদের প্রতিদিনের ক্লাসের হোমওয়ার্ক এবং পরের দিনের ক্লাস ও সামনের পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে প্ল্যান করতে হবে।

সন্তানদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে খারাপ ব্যবহার না করা:

কোন কোন বাবা-মা সন্তানদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে খারাপ আচরণ করেন। এই কাজটি মোটেও ঠিক না। এটি সন্তানের মনে আঘাত হানে। সন্তানের কোন বন্ধু যদি ভাল না হয় তাহলে তার সাথে খারাপ আচরণ না করে নিজ সন্তানকে তার বন্ধুর খারাপ দিকগুলো বুঝাতে হবে সে যেন আস্তে আস্তে এই বন্ধু থেকে নিজেই সরে আসে।

ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করা

মেধা বিকাশে সাহায্য করা: ছেলেমেয়েদের মেধা বিকাশে সর্বপ্রথমে বাবা-মাকে এগিয়ে আসতে হবে। অতঃপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। অনেক ছেলেমেয়েদেরই ভাল মেধা আছে কিন্তু সঠিক সহযোগীতা এবং গাইডেন্সের অভাবে তারা তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ পায় না।
ক্যারিয়ার পছন্দে সহায়তা করা: অনেক ছেলেমেয়েরা নিজেরাই নিজেদের ক্যারিয়ার কী হবে তা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। অবশ্যই তারা তাদের ভবিষ্যতের ক্যারিয়ারের সিদ্ধান্ত নিবে কিন্তু বাবা-মাকেও এই বিষয়ে সাহায্য করতে হবে। ছেলেমেয়েদের ক্যারিয়ার নিয়ে যেন একমুখি চিন্তা না হয় যে তারা শুধু অনেক বড় হবে অনেক টাকা কামাবে বা অনেক নামকরা একজন হবে ইত্যাদি!

সময়কে কাজে লাগানো:

সন্তানদের ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অনেক আগে থেকেই শুরু করা উচিত, যাতে তারা সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে। ভাল ক্যারিয়ারের জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে হয়।

উৎসাহ প্রদান ও মোটিভেশন: উৎসাহ মানুষকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ছেলেমেয়েদেরকে সব সময় ভাল কাজের উৎসাহ প্রদান করতে হবে, কোন একটি বিষয়ে খারাপ করলেও তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করে তাকে উৎসাহ দিলে সে পরবর্তীতে অনেক ভাল করে। মোটিভেশন হতে পারে কথা দিয়ে, পুরস্কৃত করে, কিছু আয়োজন করে।

সঠিক কোর্স পছন্দ করার বিষয়ে সাহায্য করা:

ইউনিভার্সিটি লেভেলে ছেলেমেয়েদের সঠিক কোর্স নির্ধারণে বাবা-মাকে এগিয়ে আসা উচিত। সঠিক কোর্স বাছাইয়ে ভুলের কারণে অনেক ছেলেমেয়েরাই জীবনে ভাল করতে পারে না। তাই এই বিষয়টিতে খুবই গুরুত্ব দেয়া উচিত।

সফল ব্যক্তিদের সাথে দেখা করা:

যে সকল ব্যক্তিরা জীবনে সফলতা অর্জন করেছেন তাদের সাথে ছেলেমেয়েদেরকে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেয়া যেতে পারে। এতে ছেলেমেয়েরা তাদের জীবনেও অনেক উৎসাহ পাবে।

রাজনীতি থেকে দূরে রাখা: ছেলেমেয়েদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে তারা যেন কোন রাজনীতির সাথে জড়িয়ে না যায়। হ্যাঁ তারা রাজনীতি বুঝবে, এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে, কোন দলকে সাপোর্ট করবে, কিন্তু মাঠে ময়দানে যেন কোন রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ডে সংযুক্ত না হয়। যখন তারা পড়ালেখা শেষ করে প্রফেশনাল লাইফে যাবে তখন চাইলে দেশ গড়ার জন্য সুস্থ রাজনীতি করতে পারে।

সন্তানের পরিনত বয়সে শুভ পরিণয়

সন্তান যখন শৈশব,কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করে তখন পিতা-মাতার উচিত উত্তম পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা।যদি কোনো পিতা- মাতা এই দায়িত্ব পালন না করে তবে সন্তানদের গুনাহে জড়িয়ে পরার প্রবল আশংকা রয়েছে। উপযুক্ত বয়সে সন্তানের বিয়ের ব্যবস্থা না করার দরুন বর্তমান সমাজে অপরাধ প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। চারদিকে হারাম সম্পর্কের ছড়াছড়ি, লিভ-টুগেদারসহ আরও অনেক জঘন্য বিষয়কে এমন ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে যেন এটা কোনো গুনাহ ই না।

উমর (রা:) এর একটি বিখ্যাত ঘটনা

খলীফা উমর ফারুক (রা:) এর শাসন আমলে একপিতা খলীফার দরবারে এসে অভিযোগ করে যে হে আমীরুল মু'মিন আমার সন্তান আমার কথা শোনে না, বেয়াদবি করে।খলীফা উমর (রা:) তার ছেলেকে দরবারে উপস্থিত করেন তাকে তার অভিযোগের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সেই

ছেলে খলীফাকে জিজ্ঞেস করে হে আমীরুল মু'মিন সন্তানের কি পিতার উপর কোনো হক নেই? উমর (রা:) বললেন অবশ্যই আছে। পিতার উপর সন্তানের ৩ টি হক রয়েছে ;

১.সন্তানকে উত্তম মা দিবে।

২.সন্তানের সুন্দর নাম রাখবে।

৩.উপযুক্ত সময়ে বিয়ে দিবে।

এর পর সেই ছেলে বলে আমার পিতা এই তিনটি কাজের একটিও করেনি।

বিয়েতে ছেলে মেয়ের সম্মতি থাকা

অনেক বাবা- মা ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে মনে করেন ওরা কি বোঝে আমরা যা বলব তাই, আমাদের পছন্দ হলেই হলো তাদের উদ্দেশ্যে বলব একটু থামুন আপনারা অন্যায় করছেন, নিজের মতামতকে সন্তানদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। এজন্য কাল হাশরের ময়দানে জুলুমকারী হিসেবে আপনাকে দাড়াতে হতে পারে।সংসার তারা করবে আপনরা নন,হ্যা তার অভিভাবক হিসেবে তাকে আপনি পরামর্শ দিতে পারেন,ইস্তেখারার আমল করার কথা বলতে পারেন, তাকে সাহায্য করতে পারেন কিভাবে পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করতে হয়।

অভিভাবক সব সময়ই অভিভাবক

এটি চিরন্তন সত্য, সকল পিতা-মাতাই সন্তানদের নিয়ে অনেক বড়ো আশা করে এবং তারা নিজ জীবনে যা পায়নি, তা সন্তানদের দেওয়ার চেষ্টা করে।

এই জন্যই তারা সন্তানের সবচেয়ে বড়ো অভিভাবক। এই অভিভাবকত্বের ছায়া থেকে সন্তানদের বের করে দেওয়া উচিত না; এমনকী তারা প্রাপ্তবয়স্ক হলেও। নবি-রাসূল এবং মহান ব্যক্তিরাও বয়ঃসন্ধিকালীন সময় পার হওয়ার পর সন্তানদের ছেড়ে দেননি; প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও তাদের গাইড করেছেন। এটা ঠিক, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সকলকে অবশ্যই নিজ জীবনের দায়িত্ব নিতে হবে। তারপরও আমাদের কর্তব্য হচ্ছে-যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন একে অপরকে ভালো পরামর্শ দেওয়া, গাইড করা। ইতিবাচক পারিবারিক পরিবেশে দৃঢ় পারিবারিক বন্ধনের কারণে বৃদ্ধ পিতা-মাতা সন্তানদের পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে কখনো ইতস্তত বোধ করেন না। এই পরিবেশ মুসলিম সমাজকে আরও আন্তরিকতাপূর্ণ করে তোলে। এই পরিবেশেই অতীতে মানবিক মুসলিম সভ্যতা গড়তে ভূমিকা পালন করেছে। পিতা-মাতা যখন সন্তানদের ভালোবাসা,

লালন-পালন এবং জ্ঞান প্রদানের জন্য যথাযথ প্রতিদান পান, তখন বৃদ্ধ বয়সে স্বাভাবিকভাবেই ভাবেন-তাদের খেয়াল রাখা হচ্ছে, পরিবারে তাদের মূল্যায়ন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করা হচ্ছে।

পবিত্র কুরআনে লোকমান (আ:)-এর নিজ পুত্রের প্রতি উপদেশ বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তিনি পুত্রকে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করার উপদেশ দিয়েছিলেন

সূরা লোকমান: ১৩-১৯

একইভাবে ইবরাহিম (আ:) যখন পুত্র ইসমাইল (আ:)-এর স্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অনীহা করতে দেখেন, তখন পুত্রকে উক্ত স্ত্রী ত্যাগ করে তার চেয়ে উত্তম স্ত্রী গ্রহণের পরামর্শ দেন। ইসমাইল (আ:) দায়িত্বের সাথে তাঁর পিতার আদেশ পালন করেন। এই ঘটনাটি সহিহ বুখারিতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) কর্তৃক এক দীর্ঘ হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে।

আসমা বিনতে আবু বকর (রা)-এর মাতৃত্বপূর্ণ আচরণ ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি বৃদ্ধ বয়সে পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা:)-কে বারণ করেছিলেন অত্যাচারী শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পিছপা হতে। তিনি যখন শুনলেন, পুত্র আবদুল্লাহ আশঙ্কা করছেন- শাহাদাতের পর তাঁর শরীরকে বিকৃত করা হবে, তখন তিনি আবদুল্লাহকে অভয় দিয়ে বললেন- 'তোমার লাশের অবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না।'

এই সকল কাহিনি মুসলিম পিতা-মাতার ভূমিকার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। সন্তান যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন পিতা-মাতার স্বাভাবিক দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়; কিন্তু সন্তানদের প্রতি তাঁদের ব্যাকুলতা কখনো শেষ হয় না। ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কের যে বীজ শৈশবে বপন করা হয়, তার ফলাফল পিতা-মাতা পৃথিবী ত্যাগ করা পর্যন্ত ভোগ করেন। আল্লাহ সন্তানদের চোখে পিতা-মাতাকে সম্মানিত করেছেন। কারণ, তারা সন্তানদের জন্য সবকিছুই করেছেন। বিজ্ঞ পিতা-মাতা নিজের সম্মানজনক অবস্থানের অপব্যবহার করে সন্তানদের নিকট কখনো অন্যায্য দাবি কিংবা তাদের জীবনে অহেতুক হস্তক্ষেপ করেন না। আমাদের কাজ হচ্ছে সন্তানদের যথাযথ উপদেশ দেওয়া, যা তাদের জন্য কল্যাণজনক। তারা এটি গ্রহণ করবে কি না-তা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমৃত্যু তাদের পাশে ছায়ার মতো থাকা প্রতিটি বাবা -মায়ের একান্ত কর্তব্য।

দায়িত্ত পালনে আমি কি সফল?

যখন দেখা যাবে, সন্তানরা নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী একজন দায়িত্বশীল প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হয়ে বেড়ে উঠেছে, তখন বুঝতে হবে-সন্তান লালন-পালনের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। মুসলিম যুবকদের শুধু পরিবার ও সমাজের প্রতিই দায়িত্ব নেই; বরং বৃহৎ মুসলিম উম্মাহ এবং পুরো মানবজাতির

প্রতিও তাদের দায়িত্ব রয়েছে। যে সকল পিতা-মাতা সন্তানদের শিক্ষিত করতে এবং মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য তাদের লক্ষ্যে স্থির থাকেন, তারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেন।

আধুনিক সময়ে তরুণ সমাজকে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন এবং প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে পথ দেখানো খুবই চ্যালেঞ্জিং একটি ব্যাপার। বর্তমান উদাসীনতাপূর্ণ, ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন এবং আত্মতৃপ্তির ও অহংবোধে পরিপূর্ণ বিশ্বে সমাজের মৌলিক কল্যাণার্থে সামগ্রিক প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু ইসলামের সফলতা উম্মাহর ঐক্যের মধ্যে নিহিত। কুরআনে আমাদের একতাবদ্ধ হয়ে থাকার এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

'তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং দলাদলি করো না।' সূরা আলে ইমরান: ১০৩

পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের মাঝে সমাজের জন্য কাজ করার আগ্রহ ও অনুভূতি তৈরি করা। আমার যখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই সকল কাজে অংশগ্রহণ করি, তখন আমাদের সন্তানরা স্বাভাবিকভাবেই এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

বর্তমান সংখ্যার বিচারে মুসলিম উম্মাহ অনেক বড়ো, কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তাদের প্রভাব কতটুকু? বিশ্বকে ইসলামের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর দুঃসাহসী প্রচেষ্টা শুরু করার সময় কয়জন মুসলিম ছিল? সংখ্যা যদিও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ইসলামি শক্তি তার অনুসারীদের যোগ্যতার দ্বারাই বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো-উম্মাহকে আবার পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিভাবে কাজ করা। বর্তমান সময়ে জন্য এমন কিছু মুসলিম প্রয়োজন, যারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে, যাদের মধ্যে ইসলামের আদলে মানবতাপূর্ণ সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা রয়েছে। এমন একটি সমাজ-যেটি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা, সমতা ও ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক কারণে এবং মুসলিমদের অতি ক্ষুদ্র একটা অংশের অনৈসলামিক কার্যকলাপের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এটি সত্য, শত বছরের স্থবিরতা ও অনৈক্যতা কাটিয়ে উঠে বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ নিজদের উন্নতির জন্যে অনেক দৃশ্যমান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিমরা দীর্ঘদিন ধরে আত্ম-

অনুসন্ধানে লিপ্ত এবং বর্তমানে তাদের মাঝে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক উন্নতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

অপরদিকে, বস্তুগত উন্নতি এবং বিশাল প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সত্ত্বেও আধুনিক বিশ্ব বিশাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৈন্যদশা পার করছে, যার ফলাফল সামাজিক দিক দিয়ে খুবই ভয়াবহ। ক্ষমতার ভারসাম্য ধীরে ধীরে পশ্চিমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কেউ-ই জানে না পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বিশ্বব্যবস্থা কীরকম হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজে মারাত্মক আকারে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক জায়গায় মানবধিকার লঙ্ঘন এবং নাগরিক স্বাধীনতা হরণ অতি উদ্বেগের বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক অস্থিরতাও ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি আমাদের সকলের জন্য পরীক্ষার সময়। সচেতন তরুণ মুসলিমদের উচিত আগ্রহের সাথে এটি পর্যবেক্ষণ এবং অসহিষ্ণুতা ঘৃণামুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় সমাজের অন্যান্য তরুণদের সাথে কাজ করা।

পরিসমাপ্তি

'সৎ কর্মের মানসিকতা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট উপহার। কিন্তু শিষ্টাচারের শিক্ষা পিতা-মাতার পক্ষ থেকেই আসে।'
বুখারি

বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে প্রবেশের সাথে সাথে ছেলেমেয়েরা ব্যাপক শারীরিক ও মানসিক (Emotional) পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে-এই সময়ে সন্তানদের সাথে এই সকল বিষয়ে শালীনতার সাথে খোলামেলা আলোচনা করা। ছোটো শিশুদের যেমন শারীরিক ও মানসিক চাহিদা থাকে এবং আদর যত্নের প্রয়োজন, তেমনি কিশোর ছেলেমেয়েদেরও মানসিক সমর্থন, পরামর্শ, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন-যাতে করে তারা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এই ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উচিত কিশোর সন্তানদের সাথে আরও অমায়িক আচরণ এবং তাদের জন্য আরও সহজ পন্থা অবলম্বন করা।

মানুষ কিশোর বয়সে জীবনের সবচেয়ে জটিল সময় অতিবাহিত করে। শারীরিক পরিবর্তন ছাড়াও এই সময় তারা চারদিকের বিশ্ব সম্পর্কে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং সেখানে তারা নিজেদের জড়াতে চায়। অনেকের জন্য এটি রোমাঞ্চকর বিষয়ও বটে। আবার অনেকে অজানা ভয়ে ভীত থাকে এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। অনেক কিশোর এই সময়ে দোটানায় পড়ে যায়,

ফলে তাদের মাঝে বিপরীতমুখী চরিত্র লক্ষ করা যায়। কতক সময় তারা খুবই উৎসাহী ও প্রাণবন্ত হয় এবং কতক সময় এলোমেলা ও অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করে।

যে সকল অভিভাবক এই ধরনের পরিবর্তনকে সাধারণ প্রাকৃতিক পরিবর্তন হিসেবে গ্রহণ করেন, তারা এই সকল পরিস্থিতিতে ভীত হন না। তারা সন্তান লালন-পালনে এমন এক পন্থা অবলম্বন করেন, যা পরিশেষে পিতা-মাতা ও সন্তানদের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে। এতে সন্তানরা নির্বিঘ্নে নিজের বয়ঃসন্ধিকালীন অবস্থা পার করে। সন্তান প্রতিপালনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো-তাদের জন্য এমন একটি পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি করা-যেটি হবে আধ্যাত্মিকতা, সম্মান ও হৃদ্যতায় পূর্ণ। এটা তাদের সামাজিক পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। কিশোরদের ভিত্তি যখন এই সকল পরিবেশে গড়ে উঠে, তখন তারা সামাজিকভাবে পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ একজন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। তারা হয় পিতা-মাতা ও সমাজের জন্য বিরাট সম্পদস্বরূপ। এরাই বড়ো হয়ে সমাজের ইতিবাচক সমৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

সাহায়ক গ্রন্থ:

১.মুসলিম প্যারেন্টিং লেখক ড.মুহাম্মদ আব্দুল বারী।
২.আদর্শ সন্তান গঠনে মায়ের ভূমিকা লেখক মুহাম্মদ আব্দুল জাব্বার।
৩.প্যারেন্টিং লেখক আমির জামান,নাজমা জামান।
৪.মা হওয়ার দিনগুলিতে উম্মু হাসান বিনতু সালিম।